আলোকপ্রাপ্তা নারী

নতুন নারীর সন্ধান

১.

রবীন্দ্র গল্পে অত্যাচার, অবহেলা, অনমস্কতার জবাবে অত্যাচারিত, অবহেলিত, অন্যমস্কতার শিকার নারী নিজেকে চিহ্নিত করার পথ খুঁজছিল আত্মবিকাশের পন্থাকে অবলম্বন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি পরিবারের সর্বত্র না হোক, একাংশের মধ্যে পারিবারিক পর্দানশীনতাকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে আসার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। এই ধরনের পরিবারভুক্ত বা স্বকীয় চিন্তার ও জীবনচর্যার নারীকে রবীন্দ্রগল্পে দেখা গেছে বেশ কয়েকবার। এঁদের আমরা আলোকপ্রাপ্তা নারী অভিধায় ভূষিত করতে পারি। এঁরা যে সকলেই বিদূষী, (যেমন কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রথম মহিলা ডাক্তার) তা নয়, তবু এঁদের মনোভাবের মধ্যেই ছিল চিন্তার স্ফুরণ ও দীপ্তি--রেনেশাঁস প্রভাবিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নির্ভুল চেহারা ও চরিত্র।

এই পর্যায়কেও কয়েকটা ভাগে আমরা দেখতে পাই--তাঁর সারণী ক্রম নিচে দেওয়া হল ঃ

ক. শিক্ষিতা নারী

গল্পের নাম	পটভূমি	রচনাকাল	মাস	খণ্ড
পোস্ট মাস্টার	গ্রাম	১২৯৮ (?)	--	১ম খণ্ড
একরাত্রি	গ্রাম	১২৯৯	জ্যৈষ্ঠ	১ম খণ্ড
খাতা	শহর	-	-	১ম খণ্ড
সমাপ্তি	গ্রাম	১৩০০	আশ্বিন	১ম খণ্ড
মেঘ ও রৌদ্র	গ্রাম/শহর	১৩০১	আশ্বিন/কার্তিক	২য় খণ্ড
অধ্যাপক	গ্রাম	১৩০৫	ভাদ্র	২য় খণ্ড
হৈমন্তী	শহর	১৩২১	জ্যৈষ্ঠ	৩য় খণ্ড
পাত্র ও পাত্রী	শহর	১৩২৪	পৌষ	৩য় খণ্ড
নামঞ্জুর	শহর	১৩২৪	অগ্রহায়ণ	৩য় খণ্ড

খ. রাজনীতিকে সমর্থন

মেঘ ও রৌদ্র	গ্রাম/শহর	১৩০১	আশ্বিন-কার্তিক	২য় খণ্ড
রাজটিকা	মফস্বল	১৩০৫	আশ্বিন	২য় খণ্ড
নামঞ্জুর	শহর	১৩২৪	অগ্রহায়ণ	৩য় খণ্ড
বদনাম	মফস্বল	১৩৪৮	জুন	৪র্থ খণ্ড

গ. লেখিকা নারী

খাতা	শহর	?	--	১ম খণ্ড
নষ্টনীড়	শহর	১৩০৮	বৈশাখ-অগ্রহায়ণ	২য় খণ্ড
দর্পহরণ	শহর	১৩০৯	ফাল্গুন	২য় খণ্ড
স্ত্রীর পত্র	শহর	১৩২১	শ্রাবণ	৩য় খণ্ড

ঘ. চাকুরিরতা বা স্বাধীন পেশায় নারী

অপরিচিতা	শহর	১৩২১	কার্তিক	৩য় খণ্ড

পাত্র ও পাত্রী	শহর	১৩২৪	পৌষ	৩য় খণ্ড
শেষ পুরস্কার	শহর	১৯৪৮	৫-৬ মে	৪র্থ খণ্ড
প্রগতিসংহার	শহর	১৩৪৮	আশ্বিন	৪র্থ খণ্ড

ঙ. মুক্তমনা নারী

রবিবার	শহর	১৩৪৬	আশ্বিন	৪র্থ খণ্ড
শেষকথা	পাহাড়ি এলাকা	১৩৪৬	ফাল্গুন	৪র্থ খণ্ড
ল্যাবরেটরি	শহর	১৩৪৭	আশ্বিন	৪র্থ খণ্ড

চ. সামাজিক মুক্তমন

ক. বিধবাবিবাহ ঃ

ত্যাগ	শহর	১২৯৯	জ্যৈষ্ঠ	১ম খণ্ড
প্রতিবেশিনী	শহর	?	--	২য় খণ্ড

খ. অন্য ধর্মে বিবাহ ঃ

মুসলমানীর গল্প	গ্রাম	১৩৬২	আষাঢ়	৪র্থ খণ্ড

গ. অন্য প্রতিবাদ ঃ

অনধিকার প্রবেশ	গ্রাম	১৩০১	শ্রাবণ	২য় খণ্ড
বলাই	পার্বত্য এলাকা	১৩৩৫	অগ্রহায়ণ	৩য় খণ্ড

ছ. মুক্তির ভুল দিক

ল্যাবরেটরি	শহর	১৩৪৭	আশ্বিন	৪র্থ খণ্ড
প্রগতিসংহার	শহর	১৩৪৮	আশ্বিন	৪র্থ খণ্ড

এখন আলোচনা করা হবে, আলোকপ্রাপ্তা নারীর বিভিন্নরূপের। আলোকপ্রাপ্তা নারীর ভুল রূপ, স্বেচ্ছাচারিতা সে আলোচনাও এ প্রসঙ্গে করা হল। কিন্তু এই পর্যায়ে সাল তারিখ অনুযায়ী আলোচনা করা হল না, হল ভাবনা গুরুত্বের দিক দিয়ে আলোচনা।

২.

ক লেখিকা নারী ঃ

- **খাতা** (*?*)।
- **নষ্টনীড়** (**১৩০৮**)।
- **দর্পহরণ** (১৩০৯)।
- **স্ত্রীর পত্র** (১৩২১) ।

এই পর্যায়ের চারটি গল্প হল 'খাতা', 'স্ত্রীর পত্র', 'নষ্টনীড়' ও 'দর্পহরণ'। যদিও কোন গল্পেই নারী শখ করে লিখতে বসেনি। নারী লিখতে বসেছে মুক্তির কারণে। এবং 'নষ্টনীড়' ছাড়া কোন স্থানেই লেখিকা স্বীকৃতি পাননি। আবার 'নষ্টনীড়ে' চারুর আত্মপ্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে অমলের প্রতি প্রেম আবিষ্কৃত হওয়ার পরই। আসলে সমাজ তখন লেখাকে অনুমোদন করেনি। সমাজকে নারী তখনো উপেক্ষা করেনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তোমাদের মেয়েদের এই বড় দোষ। একটা যদি কিছু হল সে আর মন থেকে তাড়াতে পার

না। কে কী বলেছে আর বলেনি, কী এসে যায় তাতে?' /মৈত্রেয়ী দেবী, *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ,* প্রাইমা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৯৯৮, কলকাতা, ৩৯ পাতা/।

কিন্তু এসে যে যায়। সমাজকে উপে(া করা খুব সহজ নয়।

খাতা (?)

'খাতা' গল্পের নায়িকা অল্পবয়সী উমা লিখতে ভালবাসে। লিখতে শিখে অবধি সে ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করেছে। 'বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অ(রে কেবলই লিখিতেছে--জল পড়ে, পাতা নড়ে।'

এমনকি বউঠাকুরাণীর বালিশের নীচে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ছিল সেটা সন্ধান করে বের করে তার পাতায় পাতায় পেনসিল দিয়ে লিখেছে কালো জল, লাল ফুল।'

বাড়ির সদাসর্বদা ব্যবহার্য নতুন পঞ্জিকা থেকে অধিকাংশ তিথিন(ত্রকে খুব বড়ো বড়ো অ(রে লুপ্ত করে দিয়েছে।

উমার বাবার দৈনিক হিসেবের খাতায় লিখেছে ঃ 'লেখাপড়া করে সেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' এতদিন তার সাহিত্যচর্চাতে কোন বাধা পড়েনি। কিন্তু তার নিরীহ দেখতে দাদা গোবিন্দলাল একদিন দেখতে পেয়ে প্রথম বাধা সৃষ্টি করে। গোবিন্দলাল যুক্তি(র কোনো সাহায্য অবলম্বন না করেও কেবলমাত্র 'রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে' সতেজে খণ্ডন-পূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করেছিল। উমা কিছু না বুঝে তার উপর বড়ো বড়ো করে লিখল--'গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।' এর ফলস্বরূপ উমাও উত্তমমধ্যম অর্থাৎ প্রহার লাভ করল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তারপর তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবশিষ্ট-পেন্‌সিল, আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহু যত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল।' অবশেষে শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে, 'গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অনুতপ্তচিত্তে উমাকে তাহার লুণ্ঠিত সামগ্রীগুলি ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি লাইনটানা ভালো বাঁধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিল।'

এই খাতাটিই হয়ে উঠল উমার নিজস্ব একান্ত সম্পদ। এই খাতাতে উমা সংগৃহীত গদ্য-পদ্য লিখল। দ্বিতীয় বছরে দু'একটি স্বাধীন লেখা দেখা গেল। অর্থাৎ তার স্বাধীনসত্তার বিকাশ ঘটল। একেবারে একটি বাক্যও পাওয়া গেল--যশিকে আমি খুব ভালোবাসি।' আবার সে লিখল--'হরির সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।' আবার এর অনতিদূরে এমন কথা আছে যাতে প্রমাণিত--'হরির মতো প্রাণের বন্ধু তার আর ত্রিভুবনে নেই।'

এভাবে একদিন উমার বিয়ে হয়ে গেল। বরটির নাম প্যারীমোহন--গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। অথচ উমার বিয়ের পরই আত্মপ্রকাশ বন্ধ হল। উমার মা বললেন--'বাছা, শাশুড়ির কথা মানিয়া চলিস, ঘরকন্নার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিস নে।'

দাদা গোবিন্দলাল তাকে বলল, প্যারীমোহনের কোন লেখার উপর কলম না চালাতে।

যশি, বাড়ির পুরানো দাসী তার সঙ্গে গেছিল। কিছুদিন থেকে সে বাড়ি চলে গেল। যশি তার খাতাটা নিয়ে গেছিল। সেই খাতায় উমা কাঁদতে কাঁদতে লিখল--

'যশি বাড়ি চলে গেছে, আমিও মার কাছে যাব।' কিংবা লিখেছে, 'দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।'

শুধু তাই নয় গোবিন্দলাল উমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনত না। এ বিষয়ে সে একটি প্রবন্ধও লিখেছিল। লোকমুখে সেকথা শুনে উমা লিখেছিল ঃ 'দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।'

উমার এই গুণ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভাল চোখে দেখেনি। এ কথা জানাজানি হল উমার তিন ননদ কনকমঞ্জরী, তিলকমঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরীর খাতার প্রতি কৌতূহলের কারণে।

প্যারীমোহন এ খবর পেয়ে আতঙ্কিত হলেন। কারণ তার মতে, 'স্ত্রীশক্তি(এবং পুংশক্তি(উভয় শক্তি(র সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্য শক্তি(র উদ্ভব হয়। কিন্তু লেখাপড়া শি(ার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি(পরাভূত হয়ে একান্ত পুংশক্তি(র প্রার্দুভাব হয়, তবে পুংশক্তি(র সঙ্গে পুংশক্তি(র প্রতিঘাতে এমন শক্তি(শালী প্রলয়শক্তি(র উৎপত্তি হয় যার দ্বারা, দাম্পত্যশক্তি(বিনাশশক্তি(র মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে সুতরাং রমণী বিধবা হয়।'

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ঃ 'বহুকাল প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ(বিধবার প((প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্রীপু(ষে গু(তর বৈষম্যের প্রমাণ।' /*বঙ্কিমরচনাবলী*, ২য় খণ্ড, বিবিধপ্রবন্ধ, (প্রাচীনা এবং নবীনা) সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ ১৩৬১, কলকাতা, ৪৯ পাতা/।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাবেলা এল এবং উমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করে বলল--'শামলা, ফরমাশ দিতে হইবে, গিন্নি কানে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন।'

অমনি উমা সংকুচিত হয়ে গেল। তার লেখার কাজ বন্ধ হল। বহুদিন বাদে এক ভিখারী গান গাইছিল ঃ

'পুরবাসী বলে, উমার মা

তোর হারা তারা এল ওই .....'

পদটি শাক্ত(সাহিত্যের। এই গানের বিষয় কন্যার কষ্টে মায়ের ব্যথা। বাঙালী মা মনে করে, শ্বশুরবাড়িতে তার মেয়ে ভাল নেই--বা চিরকালীন জননীর চিরকালীন দুঃখের ইতিহাস নিয়ে রচিত শাক্ত(পদাবলীর কবিতাগুলি।

'খাতা' গল্পের উমাও এখন শ্বশুরবাড়িতে। মাতৃবিচ্ছিন্না, আপন ইচ্ছার প্রকাশের অ(মতায় উমাও যন্ত্রণাবিদ্ধ। তাই সে-ও। একাত্ম হয়ে যায় গানটির সঙ্গে।

গান শুনে অভিমানী হয়ে উঠল উমা। গোপনে গায়িকাকে ডেকে দ্বার(দ্ধ করে বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখতে আরম্ভ করল।

তিন ননদিনী যথারীতি উঁকি মারল এবং বলল, 'বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।'

আতঙ্কিত হয় উমা। কিন্তু উমার খাতা কাড়ার জন্যে কাড়াকাড়ি চলে রীতিমত। শু(হয় ধস্তাধস্তি। এক নারীর আত্মপ্রকাশের খাতা হারিয়ে যায় অন্য নারীদের পু(ষ-প্রভাবিত মানসিকতার কবলে।

প্যারীমোহন খাতাটি নিয়ে এসে ব্যঙ্গ করে পড়তে লাগল, তার অন্য তিন বোন তখন হাসতে লাগল, অন্যদিকে প্যারীমোহনের একটি খাতা ছিল, এমন কোন মানবহিতৈষী ছিল না, সেটা কেড়ে ধ্বংস করে দেয়।

'খাতা'য় আত্মপ্রকাশ আছে, তাতে বাধা বিপত্তিও আছে কিন্তু নারীর লেখিকা হবার বাসনার প্রকাশের চেষ্টাও কম কিছু নয়।

কারণ সেকালে নারী শি(া ব্যাপারটাই খারাপ চোখে দেখা হত, কলম ধরলে তো কথাই নেই। গিরিন্দ্রমোহিনী'র 'গদ্য সংগ্রহে'র ভূমিকায় একটি ছড়া আছে -

'আমাদের মধ্যে যদি কোন বিনোদিনী,
লেখে যদি ধরি করে কখন লেখনী।
কি কাজ করিলি ওলো কুলকলঙ্কিনী!
চিঠি লিখে কারে গৃহে আনিবি এখনি?
যদি কেহ বই পড়ে গৃহের ভিতরে,
ননদী অমনি তার হেরিয়া অদূরে।
লোহিত লোচনে আসে কাঁপিতে কাঁপিতে,
বলে 'বই প'ড়ে বুঝি যাইবি বিলাতে!'

বিষন্ন বদনে হায়! অমনি সুধীরে
পুস্তক রাখিতে তার নেত্রে নীর ঝরে।'

[গিরিন্দ্র মোহিনী দাসীর গদ্য সংগ্রহ ঃ সংকলন অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী। ভূমিকা অলোক রায়। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭, কলকাতা, ৯ পাতা*]*

উমা'র অবস্থাও তাই হয়েছিল। যদিও উমার স্বাধীন সত্তার বিকাশ বড়ো বেশি আগে ঘটে গিয়েছিল। আর তাই দেখা যায় উমা লিখছে--হয়তো তার দাদার প্রভাব তার উপর পড়েছে, কিন্তু সে নিজস্বভাবনাকে উন্মুক্ত(না করে দিয়ে শান্তি পায় না। অর্থাৎ শিল্পী মন তার মধ্যে ছিল। কিন্তু এর জন্যে বারবার তার হেনস্থা ঘটেছে--অবশেষে তার কলম বন্ধ হয়ে গেছে।

যদিও এ সময়কার পত্রপত্রিকায় ছোট ছোট মেয়েরা লিখছে কিন্তু স্কুলেও যাচ্ছে। ঘরে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া বা শ্বশুরবাড়িতে পড়া নিশ্চয় দুঃসাহস। সে কাজ করছে উমা--তা অবশ্যই যুগের অগ্রগমনেরই নিদর্শন। যদিও--

'শতাব্দের পর শতাব্দ সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে নারী ছিলো গৃহবন্দি। সেই বন্দিত্ব থেকে মুক্তি(র প্রচেষ্টা শু(হয় উনিশ শতকে। কুড়ি শতকে নারী সমাজের একটি ছোটো অংশ, যারা আধুনিক শি(া পেয়েছেন, জীবনের প্রায় সকল (ে ত্রে তাদের শক্তি(র পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই সাহিত্যচর্চার আগ্রহ প্রকাশ পায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি মহিলার মধ্যে। তাঁদের চর্চার (ে ত্র ছিল মূলত কবিতা, গদ্যে তাঁদের আগ্রহ ছিল সামান্য।' *[*সৈয়দ আবদুল মকসুদ,*পথিকৃৎ নারীবাদী খয়েরন্নেসা খাতুন*, সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৪, ঢাকা, পটভূমি, ১৩ পাতা*]*।

কিন্তু দু'একজন যে গদ্যও লিখছিলেন উমা'র খাতাই তার প্রমাণ। আবার খাতার অন্তর্ধানও এর কারণ হতে পারে। কারণ সমাজে তখন কেন এখনও ধারণা করা হয়, নারী লিখবে কবিতা, গদ্য বা প্রবন্ধ লিখবে পু(ষ। এবং সমাজের একাংশের ধারণা সহজেই নারীকে আকৃষ্ট করেছিল। আবার রবীন্দ্রনাথের পরিবারে গদ্যলেখিকার সন্ধান পাওয়া গেছিল। দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস, জ্ঞানদানন্দিনী'র গদ্য গ্রন্থ বা অন্যান্যদের স্মৃতিকথায় স্থান পেয়েছে সে সময়কার মহিলা লেখকের লেখা।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গল্প 'নষ্টনীড়ে' যে চা(কে পাই, সেও গদ্য লেখক। গদ্য লেখার নিজস্ব ঢঙের জন্যেই সে পুরস্কার পাচ্ছে। অর্থাৎ কেবল রোমান্টিকতা নয়, বাস্তবজীবনকে দেখার চোখ যে চা(র আছে, রবীন্দ্রনাথ সেভাবেই আভাসিত করলেন তাঁর এই নায়িকাকে। যদিও চা(র জীবন ভীষণভাবে কাব্যিক। বলা যায়, ট্রাজিক কাব্যের নায়িকা চা(।

নষ্টনীড় (১৩০৮)

নারীর আত্মপ্রকাশের অন্য একটি গল্প 'নষ্টনীড়।' অবশ্য এ গল্পের নায়িকা চা(লিখতে চেয়েছিল, কল্পিত প্রতিপ((র তুলনায় সে শ্রেষ্ঠ--এই বোধ থেকে। কিন্তু অন্যের কারণে ধরা কলম চা(র নিজস্ব হয়ে ওঠেনি। চা(র সে ইচ্ছাও ছিল না।

এ গল্পটি পূর্বে আলোচিত। তাই আমরা গল্পের সূক্ষ্ম বি(ে-ষণে যাব না। চা(র লেখিকা হবার কোন কথা ছিল না। কিন্তু সে কিছু লেখাপড়া জানত বলে 'ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে' পরিস্ফুট হয়ে ওঠাই তার একমাত্র কাজ ছিল। চা(বিবাহিত হলেও স্বামী ভূপতির কোন দৃষ্টি ছিল না, তার দিকে। কারণ ভূপতি তখন ব্যস্ত ছিল 'ভারত সরকারের সীমান্তনীতি' নিয়ে। 'নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে চিরপুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।' এসময় চা(র জীবনে প্রবেশ করেছিল অমল।

অমল ও চা(র বন্ধুত্ব এক হয়ে প্রকাশ পায় বাগান গঠনের মধ্যে। পরে চা(আবিষ্কার করে অমলের লেখক সত্তাকে। ত্র(মাগত লেখালেখিকে কেন্দ্র করে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। যে বন্ধুত্বের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাছাকাছি আসা। চা(র কাছে লেখাটা মূল উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু অমল লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল এবং হয়েও ছিল। অন্যদিকে চা(র ভাইয়ের স্ত্রী মন্দার কাছে অমল নিজের লেখা পড়লে চা(ও লুকিয়ে লুকিয়ে লেখিকা সত্তাকে উন্মোচন করে।

চা(প্রথমে অমলের নকল হতে শু(করে। চা(লিখেছিল ঃ 'সখী কাদম্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের

তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ।' এটি ছিল অমলের আষাঢ়ের চাঁদের উল্টোদিক ঃ অমল লিখেছিল 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।'

কিন্তু লেখার (মতা চা(রও ছিল। তার নিজস্ব ভাবনা ত্র(মাগত জাগ্রত হল ঃ 'চাঁদ মেঘ, শেফালি, বউ কথা কও এ সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায় অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল(সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা, ভয়, উৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরাণীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প এই সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল।'

শুধু তাই নয় চা(র আরো একটি ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল লেখাকে কেন্দ্র করে--একটা যৌথ মাসিক কাগজ করার কথা ভেবেছিল সাংগঠনিক চিন্তায় চিন্তিত চা(। কিন্তু চা(র ইচ্ছা ছিল কেবল দু'কপি করে কাগজ বের হবে। একটি হবে অমলের, একটি তার নিজের জন্যে।

কিন্তু অমলের গোপনতার প্রতি উৎসাহ চলে গেছে। কারণ, তার ল(্য প্রতিষ্ঠা।

এরপর চা(র লেখা প্রকাশ পেল অমলেরই উদ্যোগে। চা(লিখল 'সরো(হ' পত্রিকায়, অন্যদিকে 'বি(বন্ধু'তে চা(র লেখার প্রশংসামূলক সমালোচনা বের হল। পাশাপাশি অমল ও মন্মথ দত্তের লেখার সমালোচনা আছে তাতে।

চা('আরামের জন্য অতিনিভৃতে যে একটি সাহিত্য নীড় রচনা করিতেছিল হঠাৎ প্রশংসা--শিলাবৃষ্টির একটা বড়ো রকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্খলিত করিবার জো করিল।' সবথেকে বড় কথা এই প্রশংসা চা(র ভালও লাগল না। কেন না চা(বুঝল এই প্রশংসার ফলে অমলের থেকে সে সরে গেল। অন্যদিকে প্রেমের স্বাভাবিক ল(ণ অনুসারে অমলও তাকে ভুল বুঝল। অমল চা(র লেখিকা সত্তার স্ফুরণ চেয়েছিল কিন্তু পরিণতি সম্পর্কে সে অজ্ঞ ছিল। চা(র কাছে প্রশংসা এসে অমল ও চা(কে দূরে সরিয়ে দিল। যা ছিল খেলা, তা পরিণত হল, খেলা ভাঙার বিষয়ে।

চা(কে ভূপতি একদিন ঠাট্টা করেছিল। চা(কে মজাচ্ছলে ভূপতি জানিয়েছিল--'চা(তুমি যে লেখিকা হইয়া উঠিবে পূর্বে এমন তো কোন কথা ছিল না।' অর্থাৎ চা(যেন শর্ত ভেঙেছে। চা('র লেখিকা সত্তায় ভূপতি খুশি কিন্তু চা(র এই হয়ে ওঠায় ভূপতি বিস্মিত। চা(কে সে এভাবে কল্পনা করেনি।

চা(এরপরও গোপনে লিখত কিন্তু সে বাধা পেল। কারণ ভূপতি চা(র লেখা দেখতে চাইল। আর ভূপতিকে চা(তার লেখা দেখাতেও চায়নি। চা(র লেখার কারণ অমলকে খুশি করা। তার পাঠক একমাত্র অমল। আর কারো প্রশংসায় সে ধন্য নয়। গবেষক বিনয়ভূষণ রায় লিখেছেন--'ঢাকার শি(িত যুবকদের মধ্যে শি(িত মেয়ে বিয়ে করার আগ্রহ সেই সময়ে দেখা দেয়। এর ফলে বিবাহিত বধূদের তারা লেখাপড়া শেখাত। শত সুন্দরী মেয়েও সেই সময়ে লেখাপড়া না জানলে অচল বলে গণ্য হত। লেখিকার পোশাকে সেই সময়ে তারা উৎসাহ দিত এবং স্ত্রীর সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে স্বামী গর্ব করত।' /বিনয়ভূষণ রায়, *জেনানা মিশন,* মর্ডাণ কলম, প্রথম প্রকাশ ১৪০৩, কলকাতা, ৮৩ পাতা/।

আর খাতা একদিন নানা 'আবরণ আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।'

যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। 'খাতা'র মত না হলেও চা(র কলম সরে যাওয়ার কারণ সে নিজেকে এভাবে ভাবতেও চায় না।

চা(র লেখা বন্ধই হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কন্যা মী(কে--'তোর কলম বোধহয় বন্ধ আছে।' /রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, চতুর্থ খণ্ড (পত্র সংখ্যা-৫, ১লা আগস্ট, ১৯১১, শান্তিনিকেতন) বি(ভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৫০, কলকাতা, ৫২ পাতা/। মেয়েদের কলম ধরা যেমন খুব শক্ত(, ছাড়াটাও অনেক সহজ তিনি জানতেন। যদিও ভূপতি চা(কে পাবার জন্যে, চা(কে জয় করার জন্যে চা(র সঙ্গে লেখালেখি করে দেবী বানিয়ে চা(র লেখাকে উৎসাহিত করতে চেয়েছে। কিন্তু সে কোন ভূপতি? যখন চারদিক হতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ভূপতি। সেই ভূপতি যাই হোক তবু উচ্চবিত্ত পরিবারের বউ চা(কিছুটা হলেও উৎসাহ পেয়েছে পরিবার থেকে লেখালেখির জন্যে। অমলের দিক থেকে অবশ্য এসেছে উৎসাহ ও ঈর্ষা এবং ভূপতি ভেবেছে, চা(এসব নিয়ে আছে বেশ

আছে।

চা(র আত্মপ্রকাশ হয়নি। কারণ চা(তা চায়নি, চা(যুগকে অতিত্র(ম করতে পারেনি, বরং যুগের কণ্ঠ হয়ে গেছে। আবার 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল সম্পূর্ণই লুকোতে পেরেছে তাঁর লেখা। যে 'খাতা'র নায়িকার মত অপমানিত হয়নি আবার চা(র (১৩২১) মত লেখাকে লুকিয়ে ফেলেনি। সে বুঝেছে এ সময়টা লেখিকার নয়। যদিও গল্পটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১২ বছর আগেই।

দর্পহরণ (১৩০৯)

'দর্পহরণ' বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর লেখিকা সত্তা ও বধূ-সত্তার দ্বন্দ্বের চরমতম প্রকাশরূপ। গল্পটি লেখা হয়েছে বক্ত(োর উত্তমপু(ষে। গল্পের নায়ক বলেছে ঃ 'বঙ্কিমবাবু এবং স্যার ওয়াল্টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই।'

এ গল্পের নায়ক তার বিবাহিতা স্ত্রী নির্ঝরিণী দেবীকে লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি দেবার পর জেনেছে, 'নববধূ বাংলা ভাষাটি বেশ জানেন।' এবং নায়কের বক্ত(ব্য--'সাহিত্যবোধ' ও 'ভাষাবোধ' না থাকলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেটুকু আন্দাজে বোঝা যায়।'

ইতিমধ্যে নির্ঝারিণীর জাঠতুতো বোনের বিবাহকালে স্ত্রী স্নেহের আবেগে একটা কবিতা রচনা করল, নায়কের বাবার সে কবিতা হস্তগত হল। এবং পছন্দ হওয়ায় তিনি বললেন 'খাসা হইয়াছে!' 'নববধূর যে রচনাশক্তি(আছে, একথা কাহারও অগোচর রহিল না।' এবং নায়কের বক্ত(ব্য, 'বাবা তাঁহার বধূমাতার কবিতায় রচনানৈপুণ্য স্বভাবসৌন্দর্য প্রসাদগুণ প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত নানাগুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন।' এবং নিজের প্রশংসায় রচয়িত্রীর কর্ণমূল লাল হয়ে গেল এবং সেই লজ্জার আভা গিয়ে প্রবেশ করল কোমল কপাল ছাড়িয়ে স্বামীর 'কঠিন হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কোণে।' অনেক কাল পরেও নারীর প্রতি পু(ষ কঠিন থাকে। ১৯৯৫ সালে বি(্বনারী সম্মেলনে ঘুরে এসে মালেকা বেগম লেখেন ঃ ''গারট্রুড আন্জ ইয়ং তাঁর বক্ত(ব্যে 'নারীর জগতে বধির পু(ষের' কথা বলেন--ছেলেকে মা যদি বলেন, ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলগে যাও বা স্ত্রী বলে কাজ উপল(্যে শহরে পৌঁছেই ফোন কোর, স্বামী তা ভুলে যায়।'' /মালেকা বেগম, *নারীর চোখে বি(্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৩, ঢাকা, ২৪ পাতা/।

অন্যদিকে নির্ঝরিণীর স্বামী, স্ত্রীর প্রতিভাকে স্বীকার করেনি। সে বলেছে--'বাবা তাহাকে নির্বিচারে যত উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা কী লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলার্ক্ ও কীট্সের নাইটিঙ্গেল শুনাইয়া তাহাকে এক প্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম।' তখন বিদ্যার জোরে নায়কও যেন শেলি ও কীট্সের গৌরবের কিছুটা ভাগী হয়ে পড়েছিল। নির্ঝরিণী যখন ইংরাজি সাহিত্য থেকে ভাল ভাল কিছু পড়ে শোনানোর কথা বলত, স্বামীদেবতা তখন গর্বের সঙ্গে তার অনুরোধ র(া করত। তাছাড়া নির্ঝরিণীর স্বামী মনে করত--

'স্ত্রীলোকের কমনীয়তার প(এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিতেন না--কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল।' তার মতে স্ত্রী হচ্ছে 'নিশীথের চন্দ্র', তা যদি 'মধ্যাহে(র সূর্য' হয়ে ওঠে তাহলে দু'দণ্ড বাহবা দেওয়া যায়, কিন্তু তাকে ঢাকা দেওয়া যায় কীভাবে। অথচ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ অন্যরকম এক চিঠিতে রাণুকে (লেডি রাণু) তিনি লেখেন--'আমি তোমাকে আর কিছু দেবার অবকাশ যদি না পাই তবে যেন তোমার গভীরতম আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যেতে পারি।' /সমর ভৌমিক, *রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য,* দি ইউনিক বুক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ ১৪০৪, কলকাতা, ১০২ পাতা/। আবার রাণী চন্দকে বলেছিলেন, 'দেখ, যার যে-দিকটা আছে--তাকে সেটাই ফুটিয়ে তুলতে হবে। বৃথা আর সময় নষ্ট করবি কেন?' /রাণী চন্দ, *সব হতে আপন,* বি(্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৯১, কলকাতা, ৪ পাতা/।

অন্যদিকে স্ত্রীর লেখা যখন প্রত্যেকে ছাপাতে চায় তখন নায়ক পড়ে অসুবিধেয়। স্ত্রীলোক লজ্জা পেলে, নায়ক তার সেই লজ্জাকেই প্রশ্রয় দেয়। দেয় তার লেখা ছাপাতে উৎসাহ না দিয়ে। পু(ষের থেকে নারী যে উৎসাহ পাবে, বিশেষত বাইরের জগতের একটি ব্যাপারে, সেকথা ভাবা বাতুলতা মাত্র। কারণ ঘর হচ্ছে নারীর, বাহির হচ্ছে পু(ষের--এ বি(্বাস যখন বদ্ধমূল, তখন সাধারণ পু(ষ হিসাবে নায়ক অনুপম যে স্রোতধারার আজ্ঞাবহ হবে একথা বলাই বাহুল্য।

পরিচয় দিতে না চাওয়ার কারণ, স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত হয়ে যাবার ভয়। কারণ একদিন অপরিচিত ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন-

-'আপনিই কি শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবীর স্বামী'। আমি কহিলাম, 'আমি তাঁহার স্বামী কি না, সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্ত্রী বটেন।' স্বামীর বক্তব্য--'বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রী স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি নাই।'

সিমন দ্য বোভয়া লিখেছেন ঃ *'History has shown us that men have always kept in their hands all concrete powers; since the earliest days of the patrirachy they have thought best to keep woman in a state of dependence; their codes of law have been set up against her; and thus she has been definitely established as the other.'[Semone de Beauvoir, The Second Sex, (Myths Dreams Fears Idols), Vintage, London, P. 172].*

শুধু তাই নয়, নায়কের নামে এও শোনো গেল--স্ত্রীর জ্যাঠতুতো বোনের দুর্বৃত্ত স্বামী বলে বেড়াচ্ছে--'নিজের স্ত্রীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই।'

বোভোয়া আরো লেখেন --

'A sentiment cannot be supposed to be anything. 'In the dominion of sentiments', write Gide, 'the real is not distinquised from he imaginary.' [Semone de Beauvoir, The Second Sex, (Myth and Reality), Vintage, London, P. 287]

নায়কের ভয় হল, এসব কথা চলতে থাকলে নির্ঝরের মাথা ঘুরে যাবে। বিশেষত নায়কের 'বাবার একটা বদ্ অভ্যাস ছিল, নির্ঝরিণীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন।' তাই কাউকে না পেয়ে যত বীরত্ব সব প্রয়োগ করতেন স্ত্রীর উপরই। কারণ বাঙালি পুরুষ আর কাউকে হাতের সামনে না পাক, তার স্ত্রী তার চোখের সামনে থাকে, আর সেই হয়ে যায়, তার পান্ডিত্য ফলানোর জন্যে উপযুক্ত নারী। স্ত্রীকে সম্মান করা মানে পুরুষের সম্মান নষ্ট নয়, কিন্তু স্ত্রীকে প্রশংসা ও পাশাপাশি নায়ককে নিন্দা মানে স্ত্রীর সম্মানহানি। নির্ঝর মনে করত নায়কের নিন্দায় সম্মানহানি হচ্ছে তার। নায়কের বাবা বলতেন--'হরিশ যে বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও না কেন, বউমা। আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে 'জগদিন্দ্র' লিখিতে দীর্ঘ 'ঈ' বসাইয়াছে।'

নির্ঝরিণীর স্বামী জানালেন--তিনি একটি সভায় বিখ্যাত লোকের বদলে তাকে সভাপতি করবেন। নির্ঝর কোনক্রমে বাঁচালেন তার স্বামীকে, কারণ তার বাংলা খুবই খারাপ। তার স্বামী ভাবলেন, তাঁর স্ত্রীর দর্প হয়েছে--তাই রাতে পোপের কাব্য থেকে তিনি কিছু শোনালেন এবং বললেন--'কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে--আসল জিনিসটা হইতেছে। আইডিয়া।' এবং এও বললেন--'লিখবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই।'

রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কবিত্ব শক্তি থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। তাঁহারা অন্তঃপুরে যে পারিবারিক গন্ডিটুকুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন সেখানে জীবনের অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ এবং সেখানে কল্পনাবৃত্তি প্রসারতা লাভ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া নানা উচ্চশ্রেণী সাহিত্য রচনার সহিত পরিচয়ের দ্বারা চিত্তবৃত্তির যে স্ফূর্তি ঘটে আমাদের মেয়েদের সে সুযোগও অতি অল্প [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, ৭ম খণ্ড (নির্ঝরিণী দেবীকে লেখা চিঠি, ১৮ সংখ্যা, ১১ আগস্ট ১৯১১), বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৬১ পাতা]।

নির্ঝরিণীও প্রতিবাদ করে বলেছিল--'কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না। মেয়েরা ততই কি হীন'।

ঐ চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'আমাদের লেখিকাদের কবিতা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দুর্বলভাবে বিচরণ করে--তাহার মধ্যে সরলতা ও কোমলতা থাকে কিন্তু যথেষ্ট শক্তি থাকে না। এইজন্যে সাহিত্য এইরূপ কবিতা কোনোমতেই নিত্যস্থান লাভ করে না। তাহা জুঁইফুলের মত এক সন্ধ্যার মধ্যেই ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে। কবির কবিত্বশক্তির অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে--জগতের সঙ্গে মানবজীবনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ অতিসামান্য বলিয়াই তাঁহাদের কবিত্ব কিছুদূর পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইয়া আর বেশি বাড়িতে পায় না।'

নির্ঝরিণী স্বামীর সভাপতিত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরদিন কাগজে একটা খবর বের হল--'উদ্দীপনা' বলিয়া মাসিক পত্রে ভালো গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল'।

আর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদে নায়কের খাওয়া ঘুম পর্যন্ত চলে গেল। তিনি গল্প লিখতে বসলেন। নির্ঝরিণী বলল--'আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না--আমি হার মানিতেছি।' প্রিয়নাথ সেন এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন--'রেণু'র লেখিকা কেবলমাত্র একজন স্ত্রী কবি যাঁহার দেখিবার চ(আছে--বলিবার কথা আছে--সুতরাং তিনি আমাদের যাহা দিতেছেন তাহা উচ্চদরের হৌক বা না হৌক তিনি কেবল তাহা দিতে পারেন--অপরে পারেন না। তাঁর ভাষাটি বড়ই সুন্দর এবং বেশ পরিণত। /রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, ৮ম খণ্ড, (১৬ সংখ্যক পত্র, ১৫ আশ্বিন ১৩০৭), বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ ১৩৯৯, কলকাতা, ২৭১ পাতা/। আর 'রেণু'র লেখিকা প্রিয়ম্বদা দেবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্যের সন্ধান মেলে ' চম্পা ও পাটলে'র ভূমিকায়। তাতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয় আসন লাভ করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম।' /সূত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, ৮ম খণ্ড, পত্রধৃত প্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ ১৩৯৯, কলকাতা, ৩১১ পাতা/।

আর অকৃত্রিমতার গুণে নির্ঝরিণী ৫০ টাকা মূল্যের পুরস্কার পেয়েছে। এবং নায়ক দেখল, 'উদ্দীপনা' পত্রিকা নির্ঝরিণী পুড়িয়ে ফেলছে, যাতে তার লেখা পুরস্কৃত ও মনোনীত হয়েছিল। তার স্বামীর তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে সে মানতে পারছে না। মানতে পারছে না কেন? তার স্বামী আঘাত পাবেন। তাই নির্ঝরিণীর চোখে জল। কারণ নায়ক তার সমান হতে পারছে না, নায়ক তার কাছে পরাজিত, পরাভূত--নায়ককে হতে হবে তার থেকে শ্রেষ্ঠ--এই ধারণার কাছে সে হেরে যাচ্ছে বারবার।

নায়ক ভেবেছিল, নির্ঝরিণীর লেখা প্রকাশিত হয়নি বলে, নির্ঝরের এত কষ্ট। কিন্তু আসলে তা নয়। নায়ক ভুল ভেবেছিল। তাঁর ভুল ভাঙ্গায় নির্ঝরিণীর খাতার লেখা ছাপার কথা ভাবেন। কিন্তু দেখা যায় নির্ঝরিণী রাজি হচ্ছে না। কারণ নির্ঝরিণী তার স্বামীকে পেছনে রেখে এগোতে চায় না। সে তার জীবনের লেখিকা সত্তার ইতি টানতে চায়।

'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩০০ সালে একটি খবর প্রকাশিত হয়, 'প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে লেখিকার স্বামী, পিতা বা অভিভাবক লিখিয়া দিবেন, যে তিনি যতদূর জানেন তাহাতে লেখিকা রচনা বিষয়ে সা(াৎ বা পরো(ভাবে কাহারও কোন সাহায্য গ্রহণ করে নাই।' /*বামাবোধিনী পত্রিকা*, সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, ৩য় কল্প, ২য় ভাগ ২৩৪ সংখ্যা, ৬৭ পাতা/।

নির্ঝরিণী তার স্বামীর থেকে কোন গুণে শ্রেষ্ঠ, এটা সে নিজে মানতে পারছে না। নির্ঝরিণী সে লেখা পুড়িয়ে দেয়, এবং বলে--'স্ত্রীলোকের লেখা ছাই ভাল--স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে।' হুমায়ুন আজাদ 'নারী' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ 'পু(ষতন্ত্র নারীকে নিয়োগ করেছে কন্যা, মাতা, গৃহিণীর ভূমিকায়(এবং তাকে দেখতে চায় সুকন্যা, সুমাতা, সগৃহিণীরূপে'। /হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, (অবতরণিকা), আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৮, ঢাকা, ১৫ পাতা/।

শেষ পর্যন্ত নায়কের শ্বশুরবাড়ি যাত্রার ইঙ্গিতের মধ্যে এ গল্পের সমাপ্তি। কারণ স্ত্রী শর্ত দেয় স্বামী যদি এ গল্প ছাপান তাহলে নির্ঝরিণী বাপের বাড়ি যাবার কথা ভাববে।

নির্ঝরিণী এ গল্পে ভুল বানান শুদ্ধ কয়েকটি কথা লিখেছে, যাতে প্রমাণ হয় স্বামী সব জানেন এবং তিনি মিথ্যা বলছেন, অন্যদিকে স্বামী জানায়, এটা নির্ঝরের ইচ্ছাকৃত ভুল। যশোধরা বাগচী লিখেছেন ঃ 'ঔপনিবেশিক প্রভুদের ফর্মূলা অনুসারে প্রাচীন হিন্দুত্বের পরিশোধিত 'ভারতীয় নারীত্ব'ই হইবে বিদেশি শাসকের বি(দ্ধে র(া কবচ। বলাই বাহুল্য, 'এই দুটিই মেয়েদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল।' /যশোধরা বাগচী, *নারী ও নারী সমস্যা*, (বঙ্গনারী অনিন্দিতা দেবী), প্রথম প্রকাশ ১৪০৯, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ৩৪ পাতা/।

অনেকদিন ধরে প্রচলিত ধারণা, নারী পু(ষের নিচে অবস্থান করবে। কেবল পু(ষও নয়, নারীও একথা মানত। আর তাই নির্ঝরিনী তার লেখার খাতা নষ্ট করে ফেলে, স্বামীর থেকে বেশি খ্যাতি পাবে এই ভয়ে।

এইভাবে নির্ঝরিণীরা সামান্য লিখেই নিজেদের হারিয়ে ফেলে, সামান্য কিছু তথ্য তুলে দিয়েই তারা যায় অতলতার গভীরে হারিয়ে। এই হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্র--যদিও তাঁরা 'নিজের সত্তা ও সামাজিক অবস্থানকে নানাভাবে বি(-ষণ করেছেন--কখনো

'আত্মজীবনী'র নিরিখে, কখনো উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিন্যাসে, কখনো মননকেন্দ্রিক বি(-ষণের মাধ্যমে'। /যশোধরা বাগচী, *নারী ও নারী সমস্যা*, (বঙ্গনারী অনিন্দিতা দেবী), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯, কলকাতা, ৩৪ পাতা/।

তাই লেখিকা নারী সত্তা এভাবে জাগ্রত হয়। আবার ঊনবিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তা হারিয়েও যায়।

স্ত্রীর পত্র (১৩২১)

এ গল্পটিও পূর্বে আলোচিত। কিন্তু আলোচিত হয়নি মৃণালের কবিসত্তার। মৃণাল বক্তব্যে বলিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, তেজস্বী নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। শুধু তাই নয় মৃণালের আত্মসচেতন, আত্মবিকাশশীল মনের কোণে লুকিয়ে থাকে কবিমন। মৃণাল কেবল কবিমনের অধিকারীই নয়, মৃণাল কবিতাও লেখে। মৃণাল জানায় ঃ 'আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম।' লুকিয়ে কেন? 'খাতা' গল্পে উমার পরিণতি আমরা দেখেছি। কারণ সেসময়কার সমাজে কবিতা লেখাটাই ছিল অপরাধের। তাই লুকিয়ে লিখতে হত তাকে। রাসসুন্দরী দেবী লুকিয়ে পড়তেন ভাগবত ঃ লিখেছেন সেকথা--

'সারাদিন রাত সংসারের কাজের মধ্যে পাতাটি দেখার আর সময় পাই না। রান্না করা, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার পর অনেক রাত হয়ে যায়। শেষকালে সময় বের করার উপায় ঠিক করলাম। রান্না করার সময় বই-এর পাতাটির দিকে শুধু তাকিয়েই থাকতাম। পড়তে পারতাম না। এতে আমার খুব কষ্ট হত। ঠিক করলাম, বড় ছেলে বিপিন যখন তালপাতায় লিখবে, সেখান থেকে একটা তালপাতা লুকিয়ে রাখব। এরকম না করলে তো শিখতে পারব না। তারপর একবার তালপাতা আর একবার সেই বই-এর পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে ছিল ছোটবেলার 'অ' 'আ' শেখার কথা। এইভাবেই চলতে লাগল।

ভাবতাম মেয়ে বলেই কি আমার এই দশা। চোরের মত বন্দী হয়ে জীবন কাটান! মেয়ে বলে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে হবে। পড়া এতো দোষের।' /রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, বঙ্গীয় সা(রতা প্রসার সমিতি, প্রথম প্রকাশ১৪০৬, কলকাতা, ১৭ পাতা/

'স্ত্রীর পত্রে'র নায়িকার (মতা চাপা পড়লেও নির্ঝরিণী কিন্তু এগিয়েছিল অনেকটা। যদিও গল্পটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১২ বছর আগেই।

খ. রাজনীতিকে সমর্থন

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চরমপন্থী ও নরমপন্থী কংগ্রেসের আন্দোলন গু(ত্বপূর্ণ। কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে জাগ্রত হয়েছিল স্বদেশচেতনা। এই তিন প্রে(িতে আলোচিত হবে তিনটি গল্প ঃ

- ☐ মেঘ ও রৌদ্র (১৩০৫)।
- ☐ রাজটিকা (১৩০৫)।
- ☐ বদনাম (১৩৪৮)।

মেঘ ও রৌদ্র (১৩০৫)

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের নায়ক 'বালকের মতো পাগলের মতো ' মেরেছিল অন্যায়কারী পুলিশের বড়কর্তাকে। কারণ পুলিশের বিশেষত ইংরেজ পুলিশের অত্যাচার দিনদিন বাড়ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, কীভাবে একদল ইংরাজ চাটুকারদের জন্ম হচ্ছিল ঃ 'হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন। আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরেজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।' /বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, লোক রহস্য (ইংরেজস্তোত্র), সাহিত্য সংসদ প্রথম প্রকাশ ১৩৬১, কলকাতা, ৮৭ পাতা/।

এ গল্পে শশিভূষণ কলকাতা যাত্রাকালে দু'বার দুটো ঘটনার সম্মুখীন হয়। ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় দেশের পুলিশ, ম্যানেজার

ইত্যাদিরা যে পরিমাণে বিশেষত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের উপর অত্যাচার করত। আসলে আমরাও আমাদের দেশের উপর অধিকার ছেড়ে দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি(কারও নেই। দেশের পরে স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে।' [*রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, (কালান্তর--রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিক মত), বি(ভারতী, ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপল(দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, ৬৬৪ পাতা]।

শশিভূষণের জীবনে তিনটি ঘটনা ঘটেছিল--তিনটিই ছিল ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে নিরীহ মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার।

এক. গিরিবালার বাবা হরকুমারের কাছে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের লোক কুকুরের ঘি জন্যে চার সের ঘি চাইতে এলে হরকুমার তা দেননি। তার মেথর সে ঘটনা গিয়ে জানায়। এতে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট রেগে যান এবং হরকুমারকে ডেকে পাঠান। হরকুমার ছিলেন সাহেবের পা-চাটা লোক, তবুও হরকুমার অপমানিত হল। শশিভূষণের হাজার (তি করার চেষ্টা হলেও শশিভূষণ এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে যায়। হরকুমারের হয়ে সে মানহানির মোকদ্দমা করার কথা বলে। শশিভূষণ মানহানির মামলা করলে হরকুমার পরে জমিদারের কথামত সরে দাঁড়ায়, অন্যদিকে হরকুমারের জন্যে শশিভূষণ 'কংগ্রেসওয়ালা' বলে শাস্তি পায়।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে শশিভূষণের কলকাতা যাত্রার পথে। তাঁর চোখে পড়ে ম্যানেজার সাহেব মহাজনের নৌকো স্টিমারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াকে সহ্য করতে না পেরে গুলি করে। এই ঘটনা শশিভূষণ দেখেছিলেন পান্সি থেকে। মাঝিমাল্লারা যারা র(া পেয়েছিল তাদের হয়ে শশিভূষণ ব্যবস্থা করে বিচারের। কিন্তু ম্যানেজার সাহেব বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

অন্যদিকে গ্রামের লোকেরা সা(্য দিতে চাইল না। শশিভূষণকে তারা বলল--'মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই(আমরা জাহাজের পশ্চাৎ ভাগে ছিলাম, কলের ঘরঘট এবং জলের কল্‌কল্‌ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।'

কিন্তু শশিভূষণ নতুন শি(ায় দী(িত, 'বাঙলার রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিগন্ত যে পুনর্জন্মের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল, তার প্রেরণা এসেছিল পশ্চিম থেকে। বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে কর্মরচনা করেছিল বাঙালী পশ্চিমের যা কিছু ভাল তাকে আত্মসাৎ করে।' [ভূপেন্দ্রকিশোর র(িত রায়, *ভারতে সশস্ত্র বিপ-ব*, (দুই. মহারাষ্ট্র--বিপ-বের উৎসভূমি), রবীন্দ্র লাইব্রেরি, ১ম প্রকাশ ১৩৭৭, কলকাতা, ৮ পাতা]

তৃতীয় ঘটনা ঘটেছিল, আবার কলকাতা যাত্রার পথে। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট--নদী পথে আসার সময় জেলেদের বিছানো জালের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বহুকাল থেকে তারা এই কাজ করে এবং সেজন্যে তারা খাজনাও দিত। পুলিশ সাহেব তাতে গরম হলেন, তার চেহারা দেখে জেলেরা দৌড়ল। পুলিশ সুপারের নির্দেশে সাত- আটশো টাকার জাল কেটে টুকরো টুকরো করা হল। তাতেও সাহেবের ঝাল মেটেনি, জেলেদের দরে আনার আদেশ দিলেন তিনি এবং তারা কাকুতিমিনতি শু(করল। কিন্তু ভবি তাতে ভোলেনি। জেলেদের বন্দী করা হল। এতে (ুব্ধ শশিভূষণ প্রতিবাদ করায় পুলিশের বড়ো কর্তা তাঁকে হিন্দিভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানসূচক কথা বলায় শশিভূষণ বড়ো কর্তাকে 'বালকের মতো পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।'

স্বভাবতই এই ঘটনায় জেল হয় শশিভূষণের।

শশিভূষণ ছিল একক প্রতিবাদী। নতুন শি(াব্যবস্থার সচেতন ত(ণ, যে কেবল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই জানে--কিন্তু প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে নিজের (তির কথা বিবেচনা করে না।

হরকুমাবের মেয়ে গিরিবালা শশিভূষণকে ছোট থেকেই শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুচ্চারিত ভালবাসার চোখে দেখেছিল। গিরিবালার একসময় বিয়েও হয়ে যায়। শশিভূষণ জেল থেকে ছাড়া পেলে গিরিবালা তাকে আশ্রয় দেয়। এবং তার একক প্রতিবাদের সম্মান জানায়। পরো(ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের পরাধীন দেশবাসীর প(েই সে দাঁড়ায়।

রাজটিকা (১৩০৫)

এ গল্পটিও পূর্বে আলোচিত। কিন্তু এ গল্পে আলোচিত হয়েছে 'কংগ্রেসওয়ালা' নয়, সত্যিকারের জাতীয় কংগ্রেসীদের কার্যকলাপ। যে কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের পরাধীনতা থেকে মুক্তি(র পথ খোঁজা। নারীও এই পথে সঙ্গিনী হচ্ছিল। এ গল্পে নারী কংগ্রেসের সমর্থক। আশালতা সেন লিখেছেন--'ইংরেজি ১৯২২ সালে আমি প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে যোগ দিই। এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ আর মতিলাল নেহে(র নেতৃত্বাধীন *Pro-Changer* (পরিবর্তনকামী) দল আর রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বাধীন *No-Changer* (পরিবর্তনবিরোধী) দলের ভেতর খুব বিতর্ক হয়। এই বিতর্ক কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের 'নরম' এবং 'গরম' পন্থীদের বিতর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়।' [আশালতা সেন, *সেকালের কথা*, নয়া উদ্যোগ, প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৭, কলকাতা, ১৮ পাতা]।

শুধু আশালতা সেন কেন গান্ধিজীর নেতৃত্বে ঘরে ঘরে নারীরা তৈরি করেছিলেন চরকায় কাপড় -- আসলে এটা সম্মিলিত নারীশক্তি(র সঙ্গে মিলিত জাতীয় শক্তি(। অসংখ্য মেয়ে এই আদর্শে সক্রি(য় হয়েছিলেন। নেপথ্যেও অনেকেই ছিলেন। কংগ্রেসী এক পরিবারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রায়বাহাদুর খেতাব লোভী নবেন্দুশেখরের। তার শ্বশুরবাড়িও পূর্বে ছিল ইংরেজদের সমর্থক। কিন্তু পরে দেখা যায়, . ইংরেজদের পোশাকের জন্যে সম্মান পাওয়াকে নীচ বলে মনে হয়েছিল প্রমথনাথের। কা(র কা(র আত্মসম্মান থাকে, আর কাউকে আত্মসম্মান জাগাতে হয়। কা(র আত্মসম্মানবোধ হঠাৎ জাগ্রত হয়। প্রমথনাথের আত্মসম্মান হঠাৎই জেগেছিল। আর নবেন্দুশেখরকে জাগ্রত করেছিল তার শ্যালিকারা। মজার ছলে হলেও, এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীশক্তি(র দীপ্তিময়ী কল্যাণী রূপকেই প্রশ্রয় দিয়ে এঁকেছেন, প্রকারান্তরে তাদের বিনয়িনী সাজিয়েছেন।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটি ছিল রসিকতার স্তরে, কিন্তু নবেন্দুশেখর যখন রায়বাহাদুর হব হব, তখন তার স্ত্রী অ(ণলেখা বারবার বলল 'না, দিদি, আর যাই হই, আমি রায়বাহাদুরণী হইতে পারিব না।' এরই ফলশ্রুতিতে লাবণ্যলেখা দায়িত্ব নিলেন নবেন্দুশেখর 'রায়বাহাদুর' উপাধি যাতে না পান তার। অ(ণলেখার আতিথ্যে মুগ্ধ, অ(ণলেখার কথামত নবেন্দুশেখর কংগ্রেসে চাঁদা দিয়ে দেয় আর কাগজে সে নিয়ে কংগ্রেসের প(ে তাকে ধন্যবাদও জানানো হয়। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক এবং শেষমেশ প্রমাণ হয়ে যায় নবেন্দুশেখর কংগ্রেসের লোক।

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর একদল ত(ণদলের নেতৃত্বে যেমন জাতীয়চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল, 'আমরা নিজেদের স্বদেশি পরিবারের মেয়ে বলেই মনে করতাম। তাই স্বদেশি চেতনা আমার ছেলেবেলা থেকেই। বলতে পার বিদ্যাময়ী আবাসিক স্কুলের ছাত্রীজীবন থেকে আমরা স্বদেশি জীবনের সূচনা। স্বদেশি আন্দোলনে মৈমনসিং-এর জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য এবং রাণি মাতাজি গঙ্গাবাঈ খুব সাহায্য করেছিলেন।' [*খোঁজ এখন পত্রিকা*, (কমলা মুখোপাধ্যায়ের সা(াৎকার), সম্পাদনা - কৃষ(া বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৯ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ৩২ পাতা]।

কিন্তু এ গল্পে আমরা পেয়েছি কংগ্রেসের সমর্থক একদল নারীকে যারা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং তারা দেশকে প্রকারান্তরে স্বাধীন করার কথা ভাবেন। রাজনৈতিক চেতনায় স্বচ্ছতা অবশ্যই পরিবার থেকে আসে, এবং তার নিয়ন্ত্রক পু(ষই(কিন্তু সচেতনতায় রাজনীতির থেকে দেশকে অগ্রগামী ভূমিকা নিতে বাধ্য করে নারীরা।

বদনাম (১৩০৮)

কংগ্রেসের চরমপন্থী আন্দোলনের বা সশস্ত্র বিপ-ব পরবর্তীকালে ভারতবষের ইতিহাসকে নতুন এক দিকে নিয়ে গেছিল। রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বিপ-ব নিয়ে লিখেছেন 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এ সময়টা ছিল সশস্ত্র বিপ-বীদেরই দিন--

''বাঙলাদেশই অবশ্য ইংরেজের দাসত্ব সর্বপ্রথম স্বীকার করে নিয়েছিল। আবার এই বাঙলাদেশেরই মহারাজা নন্দকুমার সর্বপ্রথম সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন ইংরেজের নীচতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এবং ইংরেজের কারাগারে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে।' .....বিপ-বীরা জানতেন যে, 'বিদ্রোহ' বিপ-বেরই পূর্বগামী। বিদ্রোহ ব্যতীত 'বিপ-ব' আসে না, বিপ-বের মধ্যে 'বিদ্রোহী'রই পদসঞ্চার। একটা জাতি সব দিক থেকে দুর্বল ও অধঃপতিত হলেই তাকে অপর কোন শক্তি(শালী জাতি পদানত করে। সেই পরাধীনতার অভিশাপে উত্ত(জাতির বাইরেকার রূপ প্রাণহীন হয়, নিরাশা তাকে নিবীর্য করে। তখন সারা দেশ জুড়ে একটি মানুষেরও উষ(

নিঃশ্বাস উঠে আসে না।'' [ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, *ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব* (বিপ্লবী বাঙলা), রবীন্দ্র লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭, কলকাতা, ৩০-৩২ পাতা]।

অন্যদিকে লেখেন 'বদনাম' গল্প--যে গল্পের পটভূমিকা বিস্তার করে আছে সশস্ত্র বিপ্লবেরই প্রতিচ্ছায়া। রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবীদের সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, তা হল--'মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী কয়েকজন তরুণের চূড়ান্ত আত্মদানের মারফত সারা দেশের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন সারা দেশবাসীর জাগরণ। আর তার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ তপস্যার।' [চিন্মোহন সেহানবীশ, *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ*, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৯২, কলকাতা, ৪১ পাতা]। বস্তুত এই দুই ঘটনাই দেখি এ গল্পে আছে। রবীন্দ্রনাথ 'ছোট ও বড়ো' প্রবন্ধে লেখেন--

'বদনাম' গল্পের নায়িকা সৌদামিনী আসলে ইনেসপেকটার বিজয়বাবুর স্ত্রী। শুধু তাই নয়, সৌদামিনী ওরফে সদু দুর্ধর্ষ ডাকাত বলে পরিচিত আসলে স্বদেশী ডাকাত অনিলের গতিবিধি জানে-- তবু স্বামীকে সে জানায় না। সদুর কাছে ভাইফোঁটা নিতে আসে অনিল, হাভানা চুরুট খায় (এখানে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি ডাকাতদের ফ্যাসানের কথা জানান) কিন্তু তাকে ধরিয়ে দেয় না। অন্যদিকে বিজয়বাবুর কাজ এই অনিলকেই খুঁজে বের করা। শুধু তাই নয়, যখনই অনিলকে ধরার প্রসঙ্গ আসে সদু বিষয়টাকে ঘুরিয়ে দেয় কথা আদায় করে নিয়ে। বিজয়বাবু জানান--মোচকাঠির জঙ্গলে নাকি তাকে পাওয়া যাবে। সেকথা শুনে জানায় সদু--'আমার কথা শোনো, ও মোচকাঠির জঙ্গল ওসব বাজে কথা। সে তোমাদেরই ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরছে। তোমাদের মুখের উপরে তুড়ি মেরে দেবে দৌড় আমি তোমাকে বলে দিলুম।'

শুধু তাই নয়, সদুকে যখন বলা হয় ধরিয়ে দেবার কথা, সদু চোখে আঁচল চাপা দেয়। বিজয়বাবু একথাও বলে ফেলেন, 'তাহলে সেই সে, মেয়েটির গুজব শোনা যাচ্ছে, সে দেখি আমার আপন ঘরেরই ভিতরকার।'

সদু ও বিজয়বাবুর একটা সহজ স্বচ্ছতা আছে। সদুর কথামত মোচকাঠির জঙ্গলে পাওয়া গেল না অনিলকে। পাওয়া গেল দিদিকে প্রণাম জানানো একটা চিঠি ঃ 'আসামী নিরাপদ। দিদিকে আমার প্রণাম জানাবেন।' সদুকে জড়ানো হয়েছে দেখে অবাকই হয় পুলিস ইন্সপেকটার। কিন্তু বিজয়বাবুকে সদু জানায়, 'এতে অবাক হবার কী আছে? পুলিশের ঘরের গিন্নী কি আসামীর ঘরের দিদি হতেই পারে না। সংসারের সব সম্বন্ধই কি সরকারী খামের ছাপমারা। আমি আর কিছু বলব না।'

এদিকে সদু প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে সেই মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল কিনা! সদু মন্তব্য করে, 'মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোল আনা কাজে লাগাতে পারে। পুরুষেরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা -- এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অখলা, কুকুরের গলার শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি বল না সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি।

সদুর কাছে এই ঠকানো আসলে দেশের মুক্তির কাছে নিজেকে বলি দেওয়া। সদু আসলে গোপনে গোপনে দেশের জন্যে নিবেদিত প্রাণ। আর তাই সে বলে, 'বুড়ীগুলো বলে থাকে, সদু বড় লক্ষ্মী অর্থাৎ রাঁধতে বাড়তে ঘর নিকোতে সদুর ক্লান্তি নেই। এইটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যারা মানুষের মত মানুষ, তঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি। আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারি তাহলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।''

মুক্তি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

যেথায় যত জ্ঞাতি
যত লক্ষ্মী বলে করে আমার খ্যাতি
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা --

ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা।' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা* (পলাতকা), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২, কলকাতা, ৫৫৫

পাতা]।

সদু এ যুগের বিপ-বী মেয়ে। তাই সে বলে, 'আমাদের ছদ্মবেশে ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে--হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছকের আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আস্তাকুঁড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের তিলক--আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সদুর কপালে, আর তুমি যদি মানুষের মত মানুষ হও তবে তার গুমর বুঝতে পারবে।'

সদুর কথা বুঝতে পারেনি তার স্বামী। যত(ণ না বিপ-বী রমণীর মূর্তিতে তিনি না দেখছেন, তত(ণ তিনি বি(্বাসও করেননি।

সদুকেই তিনি বলেছিলেন--মেয়েটাকে ধরে দেবার কথা। যে অনিল ডাকাতের তান্ত্রিকের মত কাজ করে। সদু আপন স্বরূপে ধরা দেয়, কিন্তু জানায়--'তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই একজন সত্যিকার পু(ষ দেখা দেয়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এইসব সুসন্তানকে আপন প্রাণ দিয়ে র(া না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক। তোমার অগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি। যাঁর কোনো হুকুম কখনও ঠেলতে পারিনি, সকলের চেয়ে কঠিন আজকের এই হুকুম, এও আমাকে মানতে হবে।'

যেহেতু সদু তান্ত্রিকের মত সেজে দেশসেবা করেছে অনিল ডাকাতের সঙ্গে সে উপলব্ধি করে--'দুদিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী রকম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি জানি। এই লাঞ্ছনা আমি মাথায় করে নেব।' সে জানায়, তার কর্মসঙ্গীর শাস্তি হলে, সেও শাস্তি নেবে। আরও জানায়, বিজয়বাবু হয়তো নতুন সঙ্গীও পাবে। সে বলে, 'প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে।'

এ গল্পে সদু সম্পর্কে অনিল জানায়--'আপনি সদুর কথায় ভড়কাবেন না। ও একটি অসাধারণ মেয়ে, জন্মেছে আমাদের দেশে, একেবারে খাপছাড়া সমাজে। খুব ভালো করেই চিনেছি আমি ওকে, চিনি বলেই আপনাকে বলছি ও নিষ্কলঙ্ক। যে কঠিন কর্তব্য আমরা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানে ভালোবাসার কোন ফাঁকি নেই, আছে কেবল আপনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া।' নির্ভীক সদুর মত মেয়েরাই বোধহয় বলতে পারে--

'সংসারেতে ঘটিলে (তি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি (তি।'

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, (পূজা-স্বদেশ পর্যায়, বিপদে মোরে র(া করো, ব্রহ্মসঙ্গীত-৫, গীতাঞ্জলি), বি(্বভারতী , প্রথম প্রকাশ ১৩৪৫, কলকাতা, ১০০ পাতা]।

সদুর মত মেয়েরা চরমপন্থী আন্দোলনকে নানাভাবে সফল করেছিল কারণ দেশে তখন এই আন্দোলন বাষ্প উত্তেজনার দেখা দিয়েছিল। সদু এ গল্পের মাধ্যমে নিজের নারীসত্তাকে উন্মোচিত করেছিল, বিকশিত করেছিল আপনার ভাবনার। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপিত সে। তার ল(্য একমাত্র স্বামী-সেবা নয়, দেশসেবা।

রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে জুলাই মাসে কৃষ(কুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্রের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় লেখেন 'সুপ্রভাত' কবিতাটি। ঐ কবিতার দুটি চরণ ঃ

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান (য় নাই তার (য় নাই।'

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, (সুপ্রভাত), বি(্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ ১৪০২, কলকাতা, ৪৮২ পাতা]।

বস্তুত চরমপন্থী বিপ-বের সমর্থন নিয়ে দ্বিধা ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

‘বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীয় সত্য যোগসাধনের বাধা অতিত্র(মের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো লজ্জিত এইজন্য যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই একথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত(হয় না। [র*বীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড (কালান্তর--ছোটো ও বড়), বি(েভারতী ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলে(২য় সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, ৫৬৩ পাতা]।

‘কালান্তরে’ ‘ছোটো ও বড়ো’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন--

‘কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ‘দেশভক্তি(র আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি(আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা (ুদ্র বিষয়বুদ্ধি-গুলিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কন্টকিত। [*রবীন্দ্ররচনাবলী*, (কালান্তর- ছোটো ও বড়ো) দ্বাদশ খণ্ড, বি(েভারতী, ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলে(২য় সং ১৪০২, কলকাতা, ৫৬৪ পাতা]।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বা কবিতায় চরমপন্থা’র সমর্থন আছে।

১. ‘হে (ণিকের অতিথি/এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া/ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া’

২. ‘কাঁপিবে না ক্লান্ত কর/ ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর/টুটিবে না বীণা/নবীন প্রভাত লাগি/দীর্ঘরাত্রি

রব জাগি --/ দীপ নিবিবে না।’

৩. ‘ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল/কার তরে সব ছুটে এলি

সৌরভে আকুল!’

[তথ্য সূত্র রবীন্দ্রনাথ ও বিপ-বী সমাজ, চিন্মোহন সেহানবীশ, বি(েভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ ১৩৯২, বর্তমান সংস্করণ ঐ, কলকাতা, ১৭৩, ১৬৯, ১৫৯ পাতা]

এ গল্পে আমরা পাই আর এক প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে। যে প্রীতিলতা গেয়েছিলেন, মৃত্যুবরণের পনেরো দিন আগে--

‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহনদানে।’

প্রীতিলতা লিখেছেন--‘আমার এ (ুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসেছে গেছে। কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাত--এবারকার বিজয়া যেন সবচেয়ে মূল্যবান। জীবনে যা দেখিনি জীবনে যা পাইনি, জীবনে যা শিখিনি--এমন কত অভিনব জিনিস নিয়েই বিজয়া এল আজ আমার কাছে। ..... কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম, কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুত্তলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি, কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি...। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দিই কি করে?’ [চিন্মোহন সেহানবীশ, সূত্র, *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ-বী সমাজ*, বি(েভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ ১৩৯২, কলকাতা, ২৭২ পাতা]।

এ গল্পে’র নায়িকা সদুও তাই। সে নিজেকে সাধারণ জীবনে বদ্ধ করে রাখতে চায় না। সে হয়ে উঠতে চায় দেশনায়িকার প্রতীক--যাকে কেন্দ্র করে নতুন চেতনা মাথা তুলে দাঁড়াবে।

রবীন্দ্রনাথ লেখেন--‘প্রথম আমি মেয়েদের প(নিয়ে ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন? তারপরে আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।’ [১৭ মে, ১৯৪১] [রাণী চন্দ, *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ* । সূত্র (গল্পগুচ্ছ--৪র্থ খণ্ড গ্রন্থ পরিচয়) বি(েভারতী প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯,

কলকাতা, ১০২৩ পাতা]।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়েই শুধু 'নেননি, তথ্যকে প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। সদুকে বাক্‌সর্বস্ব মনে হলেও, সদুর বক্তব্যে দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা--প্রকাশ পেয়েছে।

শি(তা নারী

এই পর্বে আমরা রেখেছি আটটি গল্পকে। যদিও অনেক গল্পেই শি(তা নারীকে দেখা গেছে। যারা বাড়িতে পড়াশুনা করে।

সমাজের নারী শি(ার জন্যে এগিয়ে আসছেন অনেকেই। কেউ কেউ নারী শি(ার জন্যে সর্বস্ব দান করছেন--'জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সমুদয় বালিকাকে ৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শি(া দিবার জন্য গয়া জেলার অন্তঃপাতী টিকারীর মহারাজ কুমার একটি বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। শি(ার জন্য এরূপ দান ভারতবর্ষে আর কখনও কেহ করেন নাই।' [*প্রবাসী*, সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৪, কার্তিক, ১০৮ পাতা]।

যদিও নারীর পাশের হার সেরকম নয়। বাংলাদেশের লোয়ার প্রভিন্সের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ঃ ১৯০৩-০৪ এর রিপোর্টে ২৫ জনের মধ্যে ১৪জন পাশ করেছে--*'During the year under report, 25 girls were sent up the Entrance Examinations of the Calcutta University of whom 14 only passed.' [General report on Public Instruction the Lower Provinces of the Bengal Precidency--1903-04, National Libarary, P-36].*

আমরা এ পর্বে যে গল্পগুলি রেখেছি সেগুলির চরিত্র ল(ণ হল নায়িকারা স্ব-ইচ্ছায় লেখাপড়া শিখেছে বা তার চর্চা করছে ঃ

- ☐ পোস্টমাস্টার (১২৯৯)।
- ☐ খাতা (?)।
- ☐ একরাত্রি (১২৯৯)।
- ☐ সমাপ্তি (১৩০০)।
- ☐ মেঘ ও রৌদ্র (১৩০১)।
- ☐ অধ্যাপক (১৩০৫)।
- ☐ হৈমন্তী (১৩২০)।
- ☐ পাত্র ও পাত্রী (১৩২৪)।
- ☐ নামঞ্জুর গল্প (১৩২০)।

পোস্টমাস্টার (১২৯৮?)

এ গল্পে নায়ক, পোস্টমাস্টার, উলাপুর গ্রামে চাকরি করতে এসেছিল। শহরের ছেলে গ্রামে এলে যা হয়, নিঃসঙ্গতায় ভোগে। পোস্টমাস্টারের একমাত্র সঙ্গী ছিল রতন, যে তার নিঃসঙ্গ একাকী জীবনে হয়ে উঠেছিল বন্ধু, গৃহর(াকর্ত্রী এবং আহারের জোগানদাত্রী। এই রতনকে পোস্টমাস্টার একটু একটু করে লেখাপড়া শেখাবার কথাও বলে, নিস্তব্ধ গম্ভীর মধ্যাহ্নে(যখন নিঃসঙ্গ তার ভার যেত পোস্টমাস্টার তখন একদিন রতনকে বলেছিল, 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' বলে সমস্ত দুপুরবেলা তাকে নিয়ে 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করলেন। এরকমভাবে অল্পদিন মধ্যে তাঁরা যুক্ত(অ(রে উত্তীর্ণ হলেন। যুক্ত(অ(র যে দুটো হৃদয় যুক্ত(হওয়া, সে পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লেখাপড়া শেখানোর এই প্রচেষ্টাটুকুও এমন কিছু কম নয়। অনেকসময় শি(য়ত্রী রেখে পড়ানোও হত। অধ্যাপক ভারতী রায় 'সেকালের নারীশি(া বামাবোধিনী পত্রিকা' গ্রন্থটিতে কয়েকজন শি(িকার তালিকা দিয়েছেন ঃ

নাম	বিদ্যালয়	বেতন
শ্রীমতী ফুলমণি	ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশি(া	১৭্ টাকা।
শ্রীমতী বিশখা	রাজশাহী বিদ্যালয়	২৫্ টাকা।
শ্রীমতী হরিপ্রিয়া	কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়	২০্ টাকা।
শ্রীমতী ঈশ্বরী	ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশি(া	১৭্ টাকা।
শ্রীমতী রাধারাণি দেবী	ঢাকা শি(য়িত্রী বিদ্যালয়	১০্ টাকা।
শ্রীমতী ভগবতী	ফরিদপুর বালিকা বিদ্যালয়	২০্ টাকা।

/ভারতী রায় সম্পাদিত সেকালের নারীশি(া বামাবোধিনী পত্রিকা, উইমেন্স স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার, প্রথম প্রকাশ ১৪০০, কলকাতা, ৮৬ পাতা/।

পড়াশুনায় অভ্যস্ত ছাত্রী যখন খুঙ্গিপুঁথি নিয়ে পোষ্টমাষ্টারের কাছে আসে, তখন পোস্টমাস্টার এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছেন। শেষপর্যন্ত চলেও যান। সেই সঙ্গে শেষ হয় সময় কাটানোর জন্যে রতনের সঙ্গে গল্প আর রতনকে লেখাপড়া শেখানো বিষয়টিও।

কিন্তু এই তাগিদাটিও কম নয়। ঊনবিংশ শতকে নারীর শি(াগ্রহণ বিষয়টি এভাবে টুকরো টুকরো ভাবে সংঘটিত হচ্ছিল। তারাই সংগঠিত রূপের কারণে গড়ে উঠেছিল পাঠশালা। কিংবা নানান বিদ্যালয়।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগের ধাপ বাড়িতে শি(াদান। ঊনবিংশ শতকে নতুন শি(ার আলোক এসে পৌঁছেছিল আর সে কারণেই তৈরি হয়েছিল শি(ার চাহিদা। মেয়েরা যে নানানস্তরে লেখাপড়ায় উৎসাহী ছিল 'পোস্টমাস্টার' গল্পে তার সা(্য দেয়। পোস্টমাস্টার গল্পের প্রে(াপটে গ্রাম, রতন গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে, সেই রতনের কাছে শি(ার আলোক গিয়ে পৌঁছান অবশ্যই শি(ার (েত্রে সমাজ অগ্রগতিকে পৌঁছান অবশ্যই শি(ার (েত্রে সমাজ অগ্রগতিকে নতুন একটা মাত্রা যোগ। 'কলকাতায় ফ্রিচার্চে অরফ্যানেজদের জন্যে পড়াবার প্রত্রি(য়াটি চালু ছিল। এবং এখানে ছাত্রীসংখ্যা নেহাত কম ছিল না। কলকাতার মিঃ ডাফের মেয়েদের স্কুলে যখন ছাত্রী সংখ্যা ৬৯, কলকাতায় ফ্রিচার্চ অরফ্যানেজে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫৪ জন।' /সূত্র জেনারেল রিপোর্ট অন পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস অব দ্য লোয়ার প্রভিন্সেস অব দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৬১-৬২, ২৩ পাতা/।

কিন্তু গ্রামের মেয়ে রতনের শি(া সম্পূর্ণ হয়নি। যুক্ত(ব্যঞ্জন ছাড়িয়ে, পুঁথির মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করলেও, তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি, ছোট ছোট ছোট এই চেষ্টায় পরবর্তীকালে মহীরূহ আকার ধারণ করার সম্ভাবনা রাখে।

খাতা (?)

এই গল্পটিতে নায়িকা উমা লেখাপড়া শিখেছে, সে প্রসঙ্গ আছে। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'লিখতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো অ(রে কেবলই লিখিতেছে--জল পড়ে পাতা নড়ে।' বস্তুত শিশুপাঠ্য বই হিসাবে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' সহজ গদ্য ততদিনে গৃহীত। লিখতে শিখেছিল উমা, দেশীয় ব্যক্তি(দের অন্দরমহলে অবশ্য শি(ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

স্ত্রীশি(ার অন্তরায় হিসাবে তৎকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত--কারণগুলি এখানে পর পর উল্লেখ করা হল ঃ

(১) কানপুর থেকে কোনও একজন মহিলা 'সোমপ্রকাশের'র সম্পাদকের কাছ দুঃখ করে একখানি পত্র লেখেন। তাতে বলা হয়, স্ত্রী শি(ার প্রথম প্রতিবন্ধক হল বাল্যবিবাহ। কারণ শাস্ত্রে আছে,

'অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষ বুরোহিনী।
দশমে কন্যাকা প্রোক্ত(া ততউদ্ধং রজঃস্বলা।।'

এর ফলে আট বছর থেকে দশ বছর বয়সেই মধ্যেই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। বাপের বাড়িতে মেয়েদের শি(ারম্ভ হলেও শ্বশুরবাড়িতে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিত কারণগুলি এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

(২) 'শ্বশুর-শাশুড়ির অধীন ও অনুবর্তী হয়ে থাকার জন্য ইচ্ছা থাকলেও মেয়েদের পড়াশুনা হয় না।' [বিনয়ভূষণ রায়, *জেনানা মিশন*, প্রথম প্রকাশ ১৪০৩, মডার্ণ কলাম, ৮ পাতা]।

উমার লেখাপড়া শেখার জন্যে নয় স্বকীয় সত্তা স্ফুরণের জন্যে শ্বশুরবাড়িতে সে বাধা পায়। লেখিকা-নারী পর্বে ইতিপূর্বে আলোচিত। লেখিকাসত্তার স্ফুরণ হত না শি(ত না জানলে।

একরাত্রি (১২৯৯)

'একরাত্রি' গল্পটি পূর্বে আলোচিত। 'একরাত্রি'র নায়িকা সুরবালা পাঠশালায় পড়ত। লেখক মন্তব্য করেছেন, নায়কের বয়ানে, 'সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি এবং বউ বউ খেলিয়াছি।' যদিও এখানে পাঠশালা যাওয়া এবং 'বউ বউ খেলা' বিষয়টিই মুখ্য স্থান জুড়ে তবু পাঠশালার উল্লেখে এই চিত্রই ভেসে ওঠে, ঊনবিংশ শতকে পাঠশালা কিভাবে নারীরা অংশ নিত সেকথাও--যদিও পড়াশুনার বিষয়টা পরবর্তীতে নারী জীবনকে প্রভাবিত করেনি। আর একটা বিষয় এ গল্পের (ত্রে বোঝা যায় না, 'একরাত্রি'র সুরবালা কি, নেহাতই সখে পাঠশালায় যেত'? নায়কের সঙ্গে সুরবালার একত্রে পাঠশালায় যাওয়ার বিষয়টি বলা হলেও সুরবালা নায়কের থেকে সাত বছরের ছোট । নায়ক এরপর জানায়, 'আমি পনেরো বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় পালাইয়া আসি'। তখন সুরবালার বয়স আট। তাহলে পাঠশালা যাওয়ার বিষয়টা কি নেহাতই সখের? তা বোধহয় নয়, কারণ যেভাবে বাক্যটা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে পাঠশালা একত্রে যাবার বিষয়টা সত্য হয়। সুরবালার বিবাহ পরবর্তী জীবনে একই গ্রামে নায়কের আবির্ভাব এবং সুরবালারই স্বামী উকিল রামলোচনবাবুর সঙ্গেই নায়কের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত।

সুরবালার স্বামীর সঙ্গে 'বর্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা' সম্পর্কে আলাপ করতে করতে পাশের ঘরে চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস্, পায়ের একটু শব্দ বা চলে আসবার সময় নায়ক ল(্য করে বাতায়নবর্তিনী কৌতূহলী চোখ তাকে দেখছে। সুরবালা এই দেখায় যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনি কি এই আগ্রহের পেছনে শি(ত (চিশীল মনের স্মৃতির চিত্র কাজ করেনি? যে মন একদিন খুব কাছে ছিল সুরবালার? যে মন হয়তো একসঙ্গে শি(া নিয়ে আলোচনা চালাত।

বস্তুত ঊনবিংশ শতকে নতুন আলোক এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শি(ত সচেতন পু(ষেরযেমন জন্ম হয়েছিল, জন্ম হয়েছিল সচেতন নারীরও, হয়তো তাদের প্রত্যেকের প্রথাগত শি(া ছিল না, কিন্তু শি(ার ফলে সচেতন (চিশীল মন তৈরি হচ্ছিল। বেগম রোকেয়া লিখেছেন, 'যে পর্য্যন্ত পু(ষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শি(াও দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধাঙ্গিনীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্খা পাগলেরই শোভা পায়।' [আবদুল কাদির সম্পাদিত *রোকেয়া রচনাবলী*, (অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, বঙ্গীয় নারী শি(া সমিতি, সভানেত্রীর অভিভাষণ), প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, বর্তমান প্রকাশ ১৪০৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২২৬ পাতা]।

রামলোচনবাবু অবশ্য স্ত্রীকে শি(া দিতে অগ্রসর হননি। তবু সুরবালার গ্রাম্য জীবনের পূর্ব সহপাঠী তার শি(ত মনকে জাগিয়ে তুলতে স(ম হয়েছিল।

সমাপ্তি (১৩০০)

'সমাপ্তি' গল্পের নায়ক, অপূর্বকৃষ(রায় বি. এ. পাশ করে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। কারণ মা চাইছেন অপূর্ব বিয়েটা যেন সেরে নেয়। গ্রামের পথে পাত্রী দেখতে যাবার আগে মৃন্ময়ীর সঙ্গে দেখা হয়েছে অপূর্বর। যে পাত্রীকে সে দেখতে যায়, সে চা(পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণ যার প্রথম ভাগ, ভূগোল বিবরণ, পাটীগণিত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস ইত্যাদি পড়াশুনা করেছে। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় শি(ার পাঠত্র(মের সন্ধান পাওয়া যায়--

প্রথম বৎসরের পরী(ায়

সাহিত্য--বোধোদয়।

পাটীগণিত -- সংকলন ব্যাকরণ, নামতা ২০০ শত পর্যন্ত।

দ্বিতীয় বৎসরের পরী(ায়

সাহিত্য -- আখ্যানমঞ্জরী, পদ্যপাঠ, ১ম ভাগ, ১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

ব্যাকরণ -- সন্ধি পর্যন্ত।

তৃতীয় বৎসরের পরী(ায়

ব্যাকরণ -- কারক ৩৯ পাতা।

ভূগোল -- ভূগোলসূত্র সমাপ্ত।

ইতিহাস -- ২য় ভাগ বাঙ্গালার ইতিহাস, ৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত।

বস্তুবিচার -- ১ম অধ্যায়।

পাটীগণিত -- লঘুকরণ, মিশ্র সংকলন, ব্যবকলন, গুণন ভাগাহার, /*বামাবোধিনী পত্রিকা*, সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, ভাদ্র, ১২৭৩, ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩৭তম সংখ্যা, কলকাতা, ৩৪৩ পাতা/।

এই বিষয়গুলি অনেকসময়ই ঘরে বসে পড়ানো হত। মৃন্ময়ীর সঙ্গে অবশেষে অপূর্বর বিয়ে হয়। বালিকা মৃন্ময়ীর মন জাগেনি, সে অপূর্বর প্রেমের সমান হয়ে ওঠেনি। অপূর্ব তাকে বলে গেছিল, 'তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না।' মৃন্ময়ী একদিন দ্বার(দ্ধ করে চিঠি লিখতে বসল, অপূর্বর দেওয়া সোনালি দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়েছিল তাই বার করে ভাবতে বসল। ''খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া আঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অ(র ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, তুমি আমাকে চিঠি লেখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো। তারপর সে আরো ভেবে লিখল, 'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভলো আছেন, বিশু পুঁটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গো(র বাছুর হয়েছে।''

মনের ভালোবাসা দিয়ে লিখল, 'শ্রীযুক্ত(বাবু অপূর্বকৃষ(রায়।' লেখকের মন্তব্য, 'ভালোবাসা যতই দিক তবু লাইন সোজা, অ(র সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।'

এ গল্পটিতে নারী শি(া বিষয়টি সেভাবে আসেনি, কিন্তু অসম্পূর্ণ মনের অসচেতন প্রকাশ ঘটেছে, যার জন্যে গল্পটি অন্যরকম মাত্রা লাভ করেছে। কিন্তু অল্প শি(িত নারীর শি(া ও স্বামীকে চিঠি লেখার এমন দৃষ্টান্ত খুব কম আছে।

শান্তিপুরবাসিনী এক মহিলা একবার সংবাদপত্রে একটি পত্র দেন, 'আমরা আমারদিগের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের বেশভূষা ও আকাঙ্খীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বর্জ্জিত হইয়া অহরহ অসহ্য বিরহবেদনায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে--কালযাপন করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যথা শমতাকরণের কর্ত্তা পতি অভাবে ভূপতি।' /সুতপা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য*, (সমাচার দর্পণ, ২ চৈত্র, ১২৪১), সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, কলকাতা, ৯৯ পাতা/।

'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ীর চিঠি নেহাতই ছিল ব্যক্তি(গত। কিন্তু তারই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অপরিণত মনের ভাবনা এবং স্বামীর যোগ্য না হয়ে ওঠার যোগ্যতা না বোঝার মানসিক অযোগ্যতা। যদিও 'কঙ্কাল' গল্পে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'যদিও মানুষের বিশেষত পু(ষের মনটা দৃষ্টিগোচর নয়।'

এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কালান্তরে'র 'লোকহিত' প্রবন্ধে 'লেখাপড়া শেখাই সেই রাস্তা।' বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের প্রে(াপটে মুসলমানদের ডাক দেওয়া সত্ত্বেও না যোগদানের কারণ এ প্রবন্ধে আলোচিত। কথাটিকে আমরা নারী

ও পু(ষের অসামঞ্জস্যতার (ে ত্রেও ব্যবহার করতে পারি।

একথা ঠিক একদল উদার শি(িত পু(ষ আবার এই কাজটি নেহাতই শখে কিংবা সময় কাটানোর জন্যে নারীকে শি(াদান করছে। এর আগে পেয়েছি 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পু(ষটি সেখানে উলাপুরে চাকরি করতে গিয়ে রতনকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, আর পরবর্তী গল্প 'মেঘ ও রৌদ্র' আলোচিত হবে কিভাবে গিরিবালাকে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে, সময় কাটাবার জন্যে।

মেঘ ও রৌদ্র (১৩০১)

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে লেখাপড়া শেখার বিষয়টির উল্লেখ আছে। শশিভূষণ এম. এ. পাশ করে আইন পরী(ায় উত্তীর্ণ হয়ে কোনো কাজে ভিড়লেন না। গ্রামের লোক তাকে অহঙ্কারীও ভাবত। শশিভূষণের প্রতিবেশী এই গ্রামের মেয়ে গিরিবালা, ইস্কুলে যেতে পারত না, আর তাকে (ণে (ণে জ্ঞানের পরী(ায় ভাইদের কাছে হারতে হত। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'সূর্য পৃথিবী অপে(া বৃহৎ, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত, তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপে(া ভরে কহিত, 'ইস! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—'

গিরিবালা অবাক হত, ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে ভেবে। 'ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নি(ত্তর হইয়া যাইত, দ্বিতীয় আর কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।'

কিন্তু গিরিবালার ইচ্ছে হত, 'সে দাদাদের মতো বই লইয়া পড়ে। কোনো কোনো দিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোনো একটা বই খুলিয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উলটাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অ(রগুলি কী যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্র(ের কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অ(ি গদর্ভের একটি কথাও কৌতূহল কাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যাননঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মতো নীরবে চাহিয়া থাকিত।'

গবেষক বিনয়ভূষণ রায় 'অন্তঃপুরের স্ত্রীশি(া' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'কুসংস্কার হল সমস্ত প্রকার অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক। এদেশীয় কুসংস্কার গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল স্ত্রীশি(ার প্রতি অনীহা। বাল্যবিবাহ প্রচলিত হওয়ায় স্ত্রীশি(ার প্রতি অনীহা আরও বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্য শি(া ও সংস্কৃতি এই অনীহার ওপর প্রথম আঘাত হানে। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটি ছিল এই বিষয়ের পথিকৃৎ। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির প(থেকে স্ত্রীশি(ার পরিকল্পনা প্রথমে স্থির হলেও আর্থিক কারণে তা সম্পূর্ণ কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিদের প(থেকেও স্ত্রীশি(ার পরিকল্পনা অবশ্য গৃহীত হয়েছিল। তাই কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য খ্রিস্টান মিশনারি সোসাইটি এগিয়ে আসে। এইভাবেই এদেশে স্ত্রীশি(ার পরিবেশ প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল। পরিবেশ সৃষ্টি হলেও তার গতিপথ কিন্তু মসৃণ ছিল না। অন্তরায় হিসাবে প্রথমে দেখা দেয় জাতপাতের বিচার ও বাল্যবিবাহ নিম্নবর্ণের মেয়েদের সঙ্গে একত্রে বসে লেখাপড়া করবে—উচ্চবর্ণের লোকেরা তা কখনওই মেনে নিতে পারে না।' *[বিনয়ভূষণ রায়, অন্তঃপুরের স্ত্রীশি(া, প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৪০৪, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পাতা ১ (ভূমিকা)]*।

বিয়ে হয়েছিল এ গল্পের গিরিবালার। কিন্তু তার আগেই সে শিখে নিয়েছিল লেখাপড়া। গিরিবালার এই কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল, শশিভূষণের দ্বারা, 'গিরিবালার নিকট কথামালা এবং অ্যাখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। লোহার গরাদে দেওয়া রাস্তার ধারের ছোটো বসিবার ঘরটিতে যুবক একাকী তক্ত(পোষের উপর পুস্তকে পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিত। গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া এই নত পৃষ্ঠ পাঠনিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরী(ণ করিয়া দেখিত, পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে স্থির করিত, শশিভূষণ তাহার ভাইদের অনেক বেশি বিদ্বান। তদপে(া বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষপূর্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এইজন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাতা উল্টাতে সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবধি করিতে পারিত না।'

অবশেষে তার বিস্ময় দেখেই শশিভূষণ তাকে বইয়ের পাতার দিকে আকৃষ্ট করে। জানায়, 'গিরিবালা ছবি দেখবি আয়।' গিরিবালা

প্রথমে পালিয়ে গেছিল, পুনরায় সে আসে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। এরপর থেকে 'শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাস্টারটি তাহার (ুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অ(র, বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে--অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কী বুঝিত তাহা অর্ন্তযামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্যহৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চ(বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক-একটা অত্যন্ত অসংগত প্র(জিজ্ঞাসা করিত এবং কখনো কখনো অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না--বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অতি(ুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত।' সমস্ত পল্লীর মধ্যে সে শশিভূষণেব একমাত্র 'সমজদার বন্ধু' হয়ে উঠেছিল।

গিরিবালার যখন শশিভূষণের সঙ্গে পরিচয় হয়। তখন তার বয়স ছিল আট বছর। এখন তার বয়স দশ হয়েছে। এই দু'বছরে সে ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালা শিখে দু'চারটে সহজ বই পড়ে ফেলেছে।

এর পরবর্তীকালে শশিভূষণ জড়িয়ে পড়ল নানান ঝামেলায়। যা আলোচিত ইতিমধ্যে রাজনীতি অধ্যায়ে। গিরিবালার বাবার জন্যেই শশিভূষণ প্রথম পরাধীন ভারতবাসী হিসাবে অপমানের বোঝা কাঁধে চাপাল। গ্রামে ভ্রমণরত ম্যাজিস্ট্রেট নায়েব ও গিরিবালার বাবা হরকুমারকে অপমান করলে হরকুমার সাহায্য চাইল শশিভূষণের কাছে।

অন্যদিকে হরকুমার সুযোগ বুঝে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানায়, শশিভূষণই সব ঘটনাটা ঘটিয়েছে। শশিভূষণ যখন এইরকম পাকেচক্রে(আদালতের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে, তখন গিরিবালা আসছে পড়াশুনা করতে কিন্তু গিরিবালা শশিভূষণের মনের সাড়া পাচ্ছে না। গিরিবালা দ্বারে এসে উপস্থিত হয় আর দেখে এবং ভাবে 'শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকান্ড কঠোরমূর্তি গ্রন্থ খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উলটাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ হইল না। অন্যসময়ে শশিভূষণ যে সকল গ্রন্থ পড়িতেন, তাহার মধ্য হইতে কোনো-না-কোনো অংশ গিরিবালাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ঐ স্থূলকায় কালো মলাটের পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার যোগ্য কি দুটো কথাও ছিল না। তা না থাক, তাই বলিয়া ঐ বইখানি কি এতই বড়ো আর গিরিবালা কি এতই ছোটো।' যে বইয়ের জন্যে শশিভূষণ তাকে অবজ্ঞা করছে, সে বইখানা যাতে নষ্ট হয়ে যায়, এ জন্যে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাল।

বালিকা একদিন চা(পাঠ হাতে ব্যথিতহৃদয়ে গু(গৃহ গমন বন্ধ করল। সে দেখল, সে বই ফেলে শশিভূষণ বিজাতীয় ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃ(তা সারছে। তার বক্ত(ব্য গিরিবালা কিছুই বুঝল না। তার জামআঁটি নি(প ব্যর্থ হল।

অন্যমনস্ক শশিভূষণ একদিন খেয়াল করল, গিরিবালা আর আসে না। '(ুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। লিখতে লিখতে (ণে (ণে সচকিতে পথের দিকে তাকান।' তারপর প্রতী(াপূর্ণ দৃষ্টি বি(প্ত হয় এবং লেখা ভঙ্গ হয়। তারপর গোপনে খবর নিয়ে জানতে পারলেন, গিরিবালা পাত্র ঠিক হয়েছে। গিরিবালা বিচিত্র উপহার নিয়ে শশিভূষণের গৃহের দিকে যাচ্ছিল, বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার লজ্জাসরম না থাকায় হরকুমার তাকে ধমক দিলেন।

এরপরবর্তী ঘটনায় দেখি, প্রতিবাদী শশিভূষণের জেলবাস পর্ব। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যে গৃহ তাকে মর্যাদা দেয়, তা গিরিবালার। গিরিবালা শশিভূষণের সাহচর্য ভোলেনি, তাদের সখ্য ভোলেনি। তাই গিরিবালা সাজিয়ে রেখেছে শশিভূষণের সেই সমস্ত বই এমনকি 'একখানি বিদীর্ণ (-ট, তাহার উপরে গুটিকারক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় কথামালা এবং একখানি কাশীরাম দাসের মহাভারত।'

এ গল্পের শেষ পর্বে শি(াকেই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'সেদিনকার সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে(দিনের পর দিন (ুদ্র কাজে (ুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাহার নিজের অধ্যয়ন কার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনাকার্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল(কিন্তু গ্রামপ্রান্তের সেই নির্জন দিনযাপন, সেই (ুদ্র শান্তি, সেই (ুদ্র সুখ, সেই (ুদ্র বালিকার (ুদ্র মুখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মতো দেশকালের বর্হিভূত এবং আয়ত্তের অতীতরূপে কেবল আকাঙ্খারাজ্যের কল্পনাছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল।'

শশিভূষণ নিঃস্ব কিন্তু ছাত্রীকে একদিন শি(া তিনি দিয়েছিলেন, তা শত গুণ হয়ে ফিরে এসেছে। মানসিকভাবে তিনি আজ নিঃস্ব নন, তাই 'শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই ে(-ট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।'

সেই স্বপ্ন কি? সঠিক নারীশি(ার ফলে, স্বাধীন, স্বতন্ত্র একটি মনের জন্ম যে তার পূর্বতন মাস্টারমশায় ও ভালোবাসার জনকে আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

পাত্র ও পাত্রী (১৩২৪)

১৩২৪ সালে থেকেই 'সবুজপত্র'- র নারীরা বেশ স্বাধীনচেতা। ১৩০৮-এর চা(লেখাপড়া জানত, জানত বলে উদাসীন ভূপতির সঙ্গে দাম্পত্যের দিনগুলি নিতান্ত বোঝা হয়ে ওঠেনি। 'অপরিচিতা'র কল্যাণী লেখাপড়া জানত বলেই শি(কতা পেশায় যুক্ত(হয়েছিল। 'পয়লা নম্বরে'র অনিলা স্বামীর সঙ্গে জ্ঞানভান্ডারের স্বাদ গ্রহণ করত। এসবই শি(ত সচেতন মনেরই আত্মপ্রকাশ।

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পের নায়ক বাবার কারণে শেষপর্যন্ত আর বিয়ে করেনি। পঞ্চান্ন বছর বয়সে বেরিলিতে তিনি একটি মেয়ের সন্ধান পান। যার মা, বিধবা, কোনো সমাজে স্থান পায়নি বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। দীপালি একদিন পঞ্চান্ন'র এই নায়ককে এসে জানায়, তার বিয়ের জন্যে পাত্রের সন্ধান করতে হবে না,। কারণ সে পাত্রের সন্ধান চায় না। বরং তাকে যদি মেয়ে ইস্কুলের মাস্টারি জোগাড় করে দেওয়া হয়, তবে ভাল হয়।

এ গল্পে মেয়েটি লেখাপড়াকে আঁকড়ে ধরে, সে সমাজচ্যুত বলেই।

অধ্যাপক (১৩০৫)

এ গল্পে রয়েছে পুরষের বুদ্ধি অপে(া নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার। এ গল্প লেখার অনেক পরে কলকাতায় বি(েবিদ্যালয়ে ছাত্রীরা ভাল রেজাল্ট করছে। 'প্রবাসী', ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত একটি খবর--'ছাত্রীরা ভারতীয় বি(েবিদ্যালয়ের নানা পরী(ায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, তাঁহারা এ বিষয়ে ছাত্রদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নহেন। কলিকাতা বি(েবিদ্যালয়ে গত এম. এ পরী(ায় কয়েকটি ছাত্রী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সংস্কৃতের একটি পাঠ্যসমষ্টিতে কুমারী কমলরাণী সিংহ এবং অন্য একটি পাঠ্যসমষ্ঠিতে কুমারী প্রীতিলতা গুপ্ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে কুমারী ইলা সেন প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী প্রভাবতী বসু রসায়নী বিদ্যায় এম. এ. পাস করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোন ছাত্রী এই বিষয়ে এম এ হন নাই। কুমারী শোভা সেন বাংলা সাহিত্য এবং শ্রীমতী কনকলতা চৌধুরী দর্শনে এম. এ পাশ করিয়াছেন।' [*প্রবাসী*, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৩৮, ফাল্গুন ৪৭ সংখ্যা, কলকাতা, ৭৪২ পাতা]।

রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধে লিখেছেন--

'স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য আনন্দ দান করা। তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে সংগীত ও কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিলে তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।' [*রবীন্দ্ররচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (নরনারী), ১২৯৯ চৈত্র, বি(েভারতী ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপল(২য় সং ১৪০২, কলকাতা, ৮৯৭ পাতা]।

অর্থাৎ মেয়েদের জীবনে পড়াশুনার, মুখ্য হল আনন্দ দেওয়া। এটা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ধারণা। পরের দিকে অবশ্য এ ধারণার পরিবর্তন হয়।

'অধ্যাপক' গল্পে পু(ষের থেকে নারীর বিদ্যা বা মেধার শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু নারী তার শ্রেষ্ঠত্বকে লোকসম(জাহির করে বেড়ায় না। নায়ক একদিন তার প্রতিবেশিনীকে বই হাতে করে দেখেছিল। তার সম্পর্কে তাঁর কল্পনাও জাগ্রত হয়েছিল। এই প্রতিবেশিনীর সঙ্গে অতঃপর নায়ক দেখা করতে যায়।

প্রতিবেশী ভবনাথবাবু জানালেন--তাঁর কন্যার নাম কিরণবালা। নায়ক মহীন্দ্র ভবনাথবাবুর নিত্য অতিথি। ভবনাথবাবুর সঙ্গে

মহীন্দ্র'র নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা হত। দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাস পড়া ছিল বলে তিনি ভবনাথবাবুর সঙ্গে যে বিষয়ে আলোচনা করতেন। ভবনাথবাবুকে শোনানোর দুটো উদ্দেশ্য ছিল ঃ

১. নিজের পন্ডিতি জাহির করা।

২. ভবনাথবাবুর কন্যাকে নিজের পন্ডিতি শোনানো।

কিরণ এই আলোচনায় থাকত, কখনো কোন ছল করে উঠে চলে যেত। কিরণ হল বাস্তবের নায়িকা। যে শত শতাব্দীর কাব্যলোক থেকে অবতীর্ণ হয়ে, অনন্তকালের যুবকচিত্তের স্বপ্নস্বর্গ পরিহার করে নির্দিষ্ট একটি বাঙালি ঘরের মধ্যে কুমারী কন্যারূপে বিরাজ করছে।

মহীন্দ্র মনে করত কিরণ কিছু বোঝে না, সে কেবল বোঝে সংসার। কিন্তু 'রাসসুন্দরী দেবী, বামাসুন্দরী, জ্ঞানদানন্দিনী, স্বর্ণকুমারী দেবী, দ্রবময়ী, কৈলাসবাসিনী দেবী, অন্নদায়িনী লাহিড়ি, কুমুদিনী, মনোরমা মজুমদার, নিস্তারিণী দেবী প্রত্যেকেই বাড়িতে লেখাপড়া করেছেন'। [সুপর্ণা গুপ্ত সম্পাদিত *ইতিহাসে নারী ঃ শি(া*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ বেথুন কলেজ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৪০৮, কলকাতা, ৮৫ পাতা]। কিরণ এদেরই একজন।

কিন্তু আলোচনায়, কোনদিন বাচালতা প্রকাশ পেলেই কিরণ উঠে চলে যেত। আবার কোনদিন রান্নাঘরে তাকে ডেকে নিত। কোনদিন পেরেক সারার কাজ করত। যখনই ভবনাথবাবুর কাছে কোন না কোন কথা বলা হয়, কিরণ ভবনাথবাবুকে ছুতো করে তুলে নিয়ে যায়। যখনই দর্শনের কথা ওঠে, কিরণ তখনই তাকে ডেকে নিয়ে যায়।

মহীন্দ্রের ধারণা ছিল, কিরণ যেমন তাকে বাস্তবের রাজ্যে বিচরণ করতে বলে, তেমনি মহীন্দ্র তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে অন্য জগতে নিয়ে যাবে।

একদিন মহীন্দ্র আবিষ্কার করল কিরণ কোন ইংরেজি কবির লেখা (শেলী) পড়ছে। মহীন্দ্রের মনে হল, এই কবিতা কিরণ তার নিজের জন্যে পড়ছে না। এমনকি তার দীর্ঘনিঃশ্বাস মহীন্দ্রের জন্যেও নয়।

এবং কিরণের কাছে সাহিত্যের কথা তুলল মহীন্দ্র--কিরণ অধীর আগ্রহে তাকে ভবনাথবাবুর সঙ্গে গল্প করতে পাঠাল। শুধু তাই নয় কতগুলি কবিতা শোনাতে চাইলে কিরণ বলল, 'কাল শুনব'।

মহীন্দ্র জানতে পারল কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শনে প্রথম ডিভিশন কোঠায় নাম তুলে ফেলেছে। অন্যদিকে মহীন্দ্রের নাম কোথাও নেই। মহীন্দ্রের সন্দেহ হয়, এই কিরণবালাই কিরণ। কারণ কিরণ পরী(া দিয়েছে, যদিও একথা কেউ বলেনি তাও সন্দেহ ত্র(মেই প্রবল হতে থাকল। বাবা বা মেয়ে কেউই নিজেদের কথা বলেনি। নায়কের কথায়--'নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যা প্রচার করিতে সর্বদা এমন নিযুক্ত(ছিলাম যে, তাঁহাদের কথা ভালো করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।'

ভবনাথবাবুকে মহীন্দ্র তার পাশ করার খবর সগর্বে দিয়ে এল। ইতিমধ্যে মহীন্দ্র ল(্য করল কিরণ তাদেরই নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সঙ্গে হাসতে হাসতে ঢুকল। যে বামাচরণবাবু কলেজে মহীন্দ্রের বক্তৃ(তায় টোকা অংশের প্রশংসা করেছিল।

মহীন্দ্র এ গল্পে ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই পু(ষের প্রতিনিধি যারা অল্প বিদ্যার অহং-এ মত্ত থাকে। যারা মনে করে মেয়েরা আবার পড়বে কি? 'শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধুরা মিলে যখন মহিলাদের জন্য মহিলাপুরে স্কুল তৈরি করলেন তখন প্রচন্ড বাধা পেলেন ওখানকার জমিদার এবং প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছ থেকে।' [সুপর্ণা গুপ্ত সম্পাদিত ইতিহাসে নারী ঃ শি(া, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, বেথুন কলেজ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৪০৮, কলকাতা, ৮৫ পাতা]।

বামাচরণবাবু নারীকে শি(াদাত্রী--নারী শি(ার উৎসাহী এবং সঙ্গিনীকে নিজের সমানশি(ার মাধ্যমে সহর্ধমিনী তৈরি করেন। 'নবযুগের সাধকেরা বুঝেছিলেন একমাত্র শি(াই পারে মেয়েদের আত্মজাগরণ ঘটাতে, প্রাণের প্রদীপ প্রজ্বলিত করতে। তখন আধুনিক পু(ষ আকাঙ(া করছে এরকম আলোকপ্রাপ্তা নারীকে যে তার সহযাত্রিণী হতে পারবে। পু(ষের পাশে নারীর সমানাধিকারের প্র(্ন তখন অনেক দূরে, আগে নারীকে যথার্থ মানুষ বলে ভাবতে শেখা এবং শেখানোটাই বড় হয়ে উঠল।' [*বেথুন বিদ্যালয় সার্ধশতবর্ষ*

স্মারক গ্রন্থ ঃ ১৮৪৯-১৯৯৯, (বেথুন স্কুল ও উনিশ শতকের নারী জাগরণ--বি(েজীবন মজুমদার), সার্ধশতবর্ষ উদযাপন কমিটি বেথুন বিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৪০৬, কলকাতা, ৪১-৪২ পাতা/।

আর কিরণ প্রগতিশীল নারীর যথার্থ শি(িতা রূপ। যারা, যুগকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবে।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় ঠিকই, কিন্তু মেয়েদের জন্যে শি(ার এই যুগান্তর আসতে আরো সময়ে লেগে গেল। ১৮৮১ সালের একটি সমী(ায় দেখা যায় ১০০ জন ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী মাত্র ৬ জন। /*বেথুন বিদ্যালয় সার্ধশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ ঃ ১৮৪৯-১৯৯৯*, (বেথুন স্কুল ও দেড়শো বছরের ভারতীয় স্ত্রী শি(া, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ) সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি--বেথুন বিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৪০৬, কলকাতা, ৪৭ পাতা/।

হৈমন্তী (১৩২১)

'হৈমন্তী'র গল্পটি পূর্বে আলোচিত। কিন্তু আবার আলোচনা করার কারণ হৈমন্তীর শি(ায় উৎসাহ। হৈমন্তীর বিয়ে হয়েছিল বেশি বয়সে। তার বাবা মোটা পণের টাকা দিয়েছিলেন বিয়েতে। হৈমন্তী তার বাবাকে চিঠি দিত। হৈমন্তীর বাবা তাকে চিঠি দিত। হৈমন্তীর স্বামী বি. এ পড়ছিল। বাড়ির লোকেরা বলত--'অপুর বি. এ. পড়া মাটি হল। যদিও নায়ক বি. এ. পাশ করেছিল এবং তার কারণও ছিল হৈম। সে স্বীকার করেছে--'বি. এ ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিব এবং ভালো করিয়াই পাশ করিব। এ পণ র(া করা আমার সে অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুই'টি কারণ ছিল--'এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত।' দ্বিতীয়, 'পরী(ার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া অসম্ভব ছিল না।'

স্বামীর বা বাড়ির অন্য কারোর সঙ্গে ভাগ করে পড়ার বিষয়ে অনেক নারীই এগিয়ে গেছিল। 'ন হন্যতে' যদিও উপন্যাসেও। কিন্তু এতেও আমরা সমাজেরই ছবি পাই(কারণ সাহিত্য সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। লেখিকা লিখেছেন, 'আমার মা বারবার বৈষ(বসাহিত্য পড়তে ভালোবাসতেন, এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট বিদূষী। বৈষ(ব সাহিত্য পড়বার জন্য তিনি ওড়িয়া ভাষা ও শিখেছেন। কাকা যখন এম. এ. পরী(া দেন তখন মা তাঁর সঙ্গে বাংলায় এম. এ-র বই সব পড়েছেন। চর্যাপদ মঙ্গলকাব্য এসব মার আয়ত্ত।' /মৈত্রেয়ী দেবী, ন হন্যতে, প্রাইমা পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, কলকাতা, ৬৯ পাতা/।

এভাবেই পু(ষের জন্যে, পু(ষের হাত ধরে বহু নারী লেখাপড়া শিখত। হৈমন্তীরও এভাবেই পড়াশুনা হচ্ছিল। যদিও কলকাতায় নারীদের শি(া এ সময় প্রচলিত হয়েছে। কেবলমাত্র পু(ষকে সঙ্গদানের জন্যে, আর লেখাপড়া না করলেও চলছে। স্বাধীনতার নতুন স্বাদ গ্রহণের, সুযোগ পেয়েছে নারী। জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার বোধ থেকেই, লেখাপড়া নারীর জন্যেও দরকার, এ ভাবনা শু(হয়েছে। ১৮৪৯, এ গল্প রচনার বহু আগেই তৈরি হয়েছে বেথুন স্কুল। অভয়াচরণ মিত্র ১২৯৪ সালে, পত্র দিচ্ছেন, ১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী সভায়--'আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী সভার স্ত্রী শি(া বিভাগের বার্ষিক পরী(া গৃহীত হইবে। পরী(ণীয় বিষয় সকলের তালিকা এই সঙ্গে প্রেরিত হইল। আপনার পরিচিত যতগুলি পরী(ার্থিনী যে যে শ্রেণীর পরী(া দিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেক্যের নাম প্রভৃতি নিম্নলিখিত বিবরণগুলি আগামী পৌষ মাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সমস্ত পরী(া অন্তঃপুরিকাদিগের জন্য নির্দিষ্ট রহিল, কেবল ছাত্রবৃত্তি পরী(ায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণও উপস্থিত হইতে পারিবেন।' /বিনয়ভূষণ রায়, *অন্তঃপুরের স্ত্রীশি(া*, নয়া উদ্যোগ, প্রথম প্রকাশ ১৪০৪, কলকাতা, ১৬৭ পাতা/।

<u>কলিকাতার অন্তঃপুরিকাদের শি(ালাভ</u>

কলকাতার	বিবি সমাজের তত্ত্বাধীন	--	১৩৮
,,	ফ্রি চার্চের তত্ত্বাধীন	--	১৫০
,,	কুমারী ব্রিটেনের তত্ত্বাধীন	--	৫৫০

/ভারতী রায় সম্পাদিত সূত্র সেকালের নারী শি(া--বামাবোধিনী পত্রিকা, (বৈশাখ ১২৭৬), উইমেন্স স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার, প্রথম প্রকাশ ১৪০০, কলকাতা, ৬৩ পাতা/।

চাকুরিরতা বা স্বাধীন পেশায় নারী

রবীন্দ্রগল্পে উপস্থাপিত মেয়েরা শি(িত হলেও চাকরি করতে যেত না খুব একটা। তার কারণ চাকরি করাটা খুব প্রচলিত ছিল না। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তার 'অবতরণিকা' গল্পে দেখালেন পঞ্চাশ দশকেও বাঙালি বধূর চাকরি করাকে ভাল চোখে শ্বশুরবাড়ি নিতে পারছে না। স্বাধীনতা-উত্তর যৌথ পরিবারের অর্থনৈতিক কারণে বধূমাতার চাকরির প্রয়োজন, কিন্তু তা আবার স্বামীর জীবনে ঈর্ষাও আনে।

উদাহরণ - এক

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সরোজিনী একটু কান খাড়া ক'রে রইলেন। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বোধহয় এলেন আমাদের মহারাণী। রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর-সংসারের কথা মনে পড়ল। দুদিন ধরে মেয়েটার যে জ্বর সেদিকে ভূ(েপও নেই! যাই খুলে দিয়ে আসি।' সরোজিনী উঠে দাঁড়ালেন। সুব্রত তত্ত(াপোশে বসে এত(ণ স্ত্রীর বি(দ্ধে সমস্ত অভিযোগগুলি শুনেছিল, সরোজিনীকে বাধা দিয়ে বলল ঃ তুমি থাক না, আমিই যাচ্ছি।'

উদাহরণ - দুই

'আরতি ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল(না গেলে চলবে কি ক'রে? মেয়ের অসুখের জন্যে বলছ তো? মন্দিরার সামান্য জ্বর কি পেটের অসুখের জন্য তুমি কামাই করতে পার অফিস?'

উদাহরণ - তিন

'মাস ছয়েক আগে গরজটা অবশ্য প্রথমে সুব্রতই দেখিয়েছিল। অফিস থেকে যা মাইনে পায়, তা মাসের পনের দিন যেতে না যেতেই নিঃশেষ হবার উপত্র(ম।'

উদাহরণ - চার

'কিন্তু ইংরেজী সত্যি সত্যি বলতে পারলে তো?' সুব্রত সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছিল। 'কেন পারব না? কলোকিয়াল ইংলিশ এডিথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার বেশ রপ্ত হয়ে গেছে।'

উদাহরণ - পাঁচ

অফিসের মাইনে থেকে পুরো টাকা কোনদিনই সুব্রত ঘরে আনতে পারে না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর রিফ্রেশমেন্ট (মে টাকা পনের রেখে আসতে হয়। কিন্তু চাকরির প্রথম মাসেই মাইনে ছাড়া উপরি এনেছে আরতি। /নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *গল্পমালা* (অবতরণিকা), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, কলকাতা ১২২, ১৩১ পাতা/।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পেই যদি বাঙালি গৃহবধূকে চাকরি করতে গিয়ে এ ধরনের পারিবারিক চাপ সহ্য করতে হয় তবে রবীন্দ্রগল্পের নায়িকাদের প(ে তা কতদূর অসুবিধাজনক ছিল তা বলাই বাহুল্য। এজন্যই 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকাকে মাখন বড়াল লেনের অন্ধগলির থেকে বার করে এনেও লেখক তাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তি(দিতে পারেন নি। তা তখনকার সমাজের নিরিখে বিশ্বাসযোগ্য হতো না বলে। মৃণালকে তাই পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন লেখক। আরো পরবর্তীকালে কিন্তু সেই বাধাকে অতিত্র(ম করার অস্পষ্ট চেহারা দেখা গেল 'অপরিচিতা' গল্পে।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকাকে চাকরি করতে বের হচ্ছে, কারণ শি(াকে সে জীবনের আদর্শ হিসাবে মেনে নিচ্ছে।

এ ধরনের পেশা এ পর্বে আমরা আর দেখি না। সম্পত্তির অধিকারিণী নারীকে আমরা দেখেছি 'মেঘ ও রৌদ্র' বা 'ল্যাবরেটরি'তে। কিন্তু সম্পূর্ণ চাকুরিরতা নারী 'অপরিচিতা'র কল্যাণী। অন্যদিকে 'মানভঞ্জন' গল্পে গিরিবালা অভিনেত্রী হয়েছে--অবশ্য উপার্জনের

বিষয়টি সেখানে উহ্য, 'মানভঞ্জন' গল্পে সেটি বিবেচ্যও নয়। তাছাড়া 'মানভঞ্জনে' গিরিবালার শ্বশুরও বেনিয়া এবং ধনীই। গিরিবালার কাছে তাই অর্থ রোজগার নয়, বড় ছিল নিজের অভিনেত্রী সত্তাকে জাগ্রত করা। বা অভিনেত্রী হিসাবে নিজেকে চিনিয়ে দেওয়া। 'অপরিচিতা'র কল্যাণী শি(কতা পেশাকে অবশ্য অর্থের কারণে বেছে নেয়নি, নিয়েছে 'হলো ম্যান' সুলভ সমাজের আদর্শের বিচ্যুতি কারণে, নতুন আদর্শের সন্ধানে।

'অপরিচিতা' গল্পে আমরা দেখি কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। নায়কের আত্মবয়ানে লেখা এ গল্পে, নায়ক জানায় 'আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডুষও রস পাইবার জো নাই।'

অবশেষে পাত্রের একটি সম্বন্ধ ঠিক, হয়--সেই কল্যাণী।

মামার তত্ত্বাবধানে পাত্র বিয়ে করতে গেল। কিন্তু মেয়ের বয়স পনের বলে, মামার মুখ ভার হল। এর আগে আমরা 'হৈমন্তী' গল্পে দেখেছি মেয়ের বেশি বয়স বলে পণের টাকাও বেশি লাগছে। এ গল্পে সেরকম কোন উল্লেখ নেই। যদিও নায়ক জানায় ঃ 'পণ সম্বন্ধে দুই প(পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনার কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল।' এবং পাত্রও তাকে এব্যাপারে কোন কথা বলেনি। মামার উপর সে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। মামা বিয়ে বাড়ি ঢুকেই গোলমাল বাধাল। অন্যদিকে কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথবাবুর মেজাজটা শান্ত, দেখতে নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নেই। পাত্রের মামা বিয়ে শু(হবার আগে শম্ভুনাথবাবুকে বলল, গয়না ওজন করার কথা। শম্ভুনাথবাবু পাত্রকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। অন্যদিকে পাত্র নেহাতই হাতের পুতুল বলে কোন উত্তর দিলেন না। পাত্রপ(র উৎপাতের কথা 'যজ্ঞে(রের যজ্ঞ' গল্পে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এ গল্পে বিয়ের দিন পরিবেশনের সময় ছানাও ফুরিয়ে গেলে যজ্ঞে(র বলেন, 'আমি অতি (ুদ্র ব্যক্তি(, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই।

একজন হেসে বলেন--'মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়।'

বাংলাদেশে মেয়ের বাবা হওয়া অপরাধের ছিল। তার উপর গরীব বাবা, সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদার বংশে মেয়ে দেওয়া অন্যায়! কিন্তু যজ্ঞে(র নিজের ইচ্ছেয় বিভূতিকে পছন্দ করেনি। বিভূতিই তার কন্যাকে পছন্দ করে গেছে। বিয়ের দিন বর্ষার কাদা ও ছানায় যখন বরযাত্রী দল হামলা করছে--গোয়ালারা দল বেধে হাঙ্গামা করছে--'পাছে বরযাত্রীদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশঙ্কায় যজ্ঞে(র তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলে। অন্যদিকে বর বলল-- 'বাবা, আমাদের এ কি রকম ব্যবহার!' বলে একটা ছানার থালা থেকে নিজের হাতে তিনি পরিবেশন শু(করল।

'দেনাপাওনা'র নায়ক প্রতিবাদ করতে পারেনি, কেবল বিয়ে টুকু করা ছাড়া, আর এ গল্পের নায়ক মূল ঘটনাটারই প্রতিবাদ করে।

'অপরিচিতা' গল্পে দেখি নায়ক কনের গা থিকে গয়না খুলে ওজন করার কথা ওঠায় শম্ভুনাথবাবু বর অনুপমকে ডেকে তার মতামত জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও সে প্রতিবাদহীন। তখন শম্ভুনাথবাবু বললেন--'তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।'

দেখা গেল গয়না যা দেবার, তার থেকে বেশিই দেওয়া হয়েছে। শম্ভুনাথবাবু এ ঘটনার পর বললেন, 'না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।'

লগ্নের কথা উঠলে শম্ভুনাথবাবু বললেন, 'সেজন্য কিছু ভাবিবেন না--এখন উঠুন।' এমন কি তিনি বর অনুপমকেও খাইয়ে দিলেন। শম্ভুনাথবাবু এরপর গাড়ি বলে পাত্রপ(কে বিদায়ের আয়োজন করলেন। মামা অবাক হয়ে বললেন 'ঠাট্টা করিতেছেন নাকি?'

শম্ভুনাথবাবু বললেন 'ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।' শম্ভুনাথবাবু এও বললেন ঃ 'আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব, এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।'

অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি পাত্রের সঙ্গে কোন কথাই বললেন না। কারণ প্রমাণ হয়ে গেছে, সে কেউ নয়। রবীন্দ্রগল্পে সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার হল, যা তিনি লেখেন তা পরবর্তী কালে ঘটে বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় সমাজ। ১৩২৪ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয় ঃ

সম্প্রতি আমরা একজন কন্যার পিতার বলিষ্ঠ প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি --

'বরের পিতা শ্রীযুক্ত(.....মহাশয় একজন শি(ত লোক। বরের জননী নারায়ণগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের শি(য়িত্রী। কন্যার পিতার নাম শ্রীযুক্ত(অ(ণোদয় দাস। নিবাস দাড়োড়া। কন্যার শুভ বিবাহের দিন বরযাত্রী মহাশয়েরা মুরাদনগর পর্যন্ত নৌকাযোগে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে জনে জনে একখানা পাল্কীর দাবী করিয়া বসেন। পাল্কী সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া কন্যাপ(বলিয়া কহিয়া অল্পসংখ্যক পাল্কী দ্বারাই যাত্রী মহোদয়দিগকে স্বগ্রামে আনয়ন করে। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলা যায় না যে কারণে হউক, বরপ(নানা অজুহাতে বেচারি কন্যাকর্তার প্রতি অতিরিক্ত(ও অন্যান্য নানা টাকার দাবী উপস্থিত করিতে থাকেন। কন্যাকর্তার তাহা অসহনীয় হয় এবং তিনি এই প্রকার 'গ্রাহক' লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে একেবারেই নারাজ হন। ঘটনাত্র(মে গু(তর হইয়া অবস্থা শেষে এইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, বরকর্তাগণ ভীত সন্ত্রস্ত্র হইয়া তাঁহাদের বাসাবাড়ীর বাহিরখণ্ড হইতে অন্দর খণ্ডে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। শেষ ফলে শুভবিবাহটি হইতে পারে নাই। বর ও বরযাত্রীদিগকে (ুণ্ণমনে ত্র্যস্তগমনে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছে।

বেচারি কন্যার পিতাকে বরপ(কায়দায় পাইয়া জেরবার করা, আজকাল বৈবাহিক রীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই ((ত্রে কন্যার পিতা যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে অনেকের চ(ফুটিবে। দেশে কন্যা কর্ত্তা দিগের হর্ষ ও বরকর্ত্তাদিগের বিস্ময় যুগপৎ উদিত হইবে। *[প্রবাসী*, সম্পাদক-রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৪ শ্রাবণ, (ত্রিপুরা গেজেট, চা(বন্দ্যোপাধ্যায়) ৪২২ পাতা*]*।

'অপরিচিতা' গল্পে দেখি, বিবাহের চুক্তি(ভঙ্গ হওয়ায় মামা নালিশ করে বলে জানায়। শুধু তাই নয় এ ঘটনায় শম্ভুনাথবাবুও খুব রেগেছিলেন। এই কালোস্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল--সেটার রঙ সম্পূর্ণ কালো নয়। সেই অপরিচিতার পানে বারবার মন ছুটে যাচ্ছিল। 'কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তি(মা।' নায়ক বলে--'হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি--কেবল আর একটি মাত্র পা-ফেলার অপে(া--এমন সময়ে সেই এক পদ(পের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল।' বিনুদার কাছে গিয়ে সেই না দেখা মেয়ের রূপের গল্প শুনে এসেছিল নায়ক। নায়ক ভেবেছিল--মেয়েটি বোধহয় তার ছবি লুকিয়ে দেখে আর কাঁদে। শোনা গেল-- মেয়েটির পাত্র পাওয়া গেলেও সে জানিয়েছে সে আর বিয়ে করবে না। এতে নায়কের মন পুলকের আবেশে ভরে যায়।

কিন্তু নায়কের কল্পনার লবঙ্গলতিকার সঙ্গে বাস্তবের দৃঢ়চেতা নায়িকার ছবি'র কোন মিল পাওয়া যায় না। নায়ক একদিন মাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছিল। রেলগাড়িতে এক অজানা স্টেশনে শুনেছিল, শিগ্‌গির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।' গলাটা একটি মেয়ের। এ কেবল এমন একটা মানুষের গলা(শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই।' প্ল্যাটফর্মে সাহেবদের আর্দালি দল আসবাবপত্র নিয়ে অপে(া করছিল। ইংরেজ ম্যানেজার সাহেব যাবে তাই নায়ক এখানে ওখানে খোঁজ করছিল। এমন সময় সেই মেয়েটি বলল, 'আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না--এখানে জায়গা আছে।'

এই মেয়েটি কল্যাণী, সে এখন শি(কা। শুধু তাই নয়, সে প্রতিবাদী। ইংরেজদের জন্যে কামরা ছেড়ে দিতে হবে জেনে সে প্রতিবাদ করে। শুধু তাই নয়, সে নায়ককে বলে 'আপনি বসুন--আপনি যাচ্ছেন কোথায়?' মেয়েটি কানপুরে থাকে, কল্যাণী জানিয়েছে--সে আর বিয়ে করবে না? বিবাহ ভাঙার পর কল্যাণী মাতৃভূমির সেবা তথা শি(ার ব্রত গ্রহণ করেছে। কল্যাণীর স্বাধিকার প্রবৃত্তি আসলে আদর্শের ব্রত গ্রহণ করা।

কল্যাণীকে একদিন যে সমাজ গ্রহণ করতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কল্যাণী সেই সমাজকেই চপেটাঘাত করে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এজন্য তার কোন দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, জড়তাও নেই। কল্যাণীকে একদিন জায়গা দেওয়া হয়নি, কল্যাণী রূপ নারীর স্থান হয় না যে সমাজে, অথচ কল্যাণী মূর্তি ধরে সেই সমাজকে অর্থাৎ পু(যতান্ত্রিক সমাজকে স্থান দেয়। নারী কেবল অর্ধেক আকাশ কেন হবে, নারী সম্পূর্ণ আকাশ হয়ে ওঠে এই স্থান দেওয়ার মধ্যে। নারী প্রতিবাদী, আশ্রয়দাত্রী হিসাবে এ গল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, পাশাপাশি পু(ষ ভী(কুণ্ঠাজড়িত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া পু(যতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান না হলেও 'জায়গা আছে' শব্দে এও

বুঝিয়ে দেওয়া হয়, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পু(ষের স্থান আছে। অবশ্য পু(ষতান্ত্রিকতার বিপরীতে 'নারীতান্ত্রিক' শব্দটি না এনে, মাতৃতান্ত্রিক শব্দটি একথাই প্রমাণ করে, নারীর নারীরূপে পরিচয়ের থেকেও বড় কথা, মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ। তাই হয়তো 'মাতৃতান্ত্রিক' শব্দটি ব্যবহারে এ কথাই প্রমাণিত, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ও পু(ষ উভয়েরই স্থান আছে। যেখানে উভয়েই যেন সন্তানের মত কিংবা উভয়শক্তি(ই সহযোগী হিসাবে কাজ করে। কিন্তু পু(ষতান্ত্রিক সমাজে পু(ষ থাকবে সবসময় আগেভাগে বা উপরে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে নারীর এই অবস্থান আমরা দেখিয়েছি, কিন্তু এই পর্যায়ে এসে নারীর সামাজিক অবস্থানের সঠিক পথের নিশানা বা বলা যায় সমাজের সঠিকপথের নিশানা খোঁজার চেষ্টা করলেন লেখক। 'জায়গা আছে' সেই অন্বেষণকে ত্বরান্বিত করে লেখকের অনুসন্ধানকে সার্থক প্রতিপন্ন করে।

এ সময় যে পেশাগুলিকে দেখা যাচ্ছিল, তার মধ্যে শি(কতাই প্রধান। অবশ্য পেশা নয়, আদর্শ গ্রহণই ছিল মূল উপজীব্য। কল্যাণীও এই আদর্শ গ্রহণ করেছিল, দুটি কারণে। এক. পু(যশাসিত সমাজের ভ্রূকুটিকে উ পে(া। যদিও কোথাও তা সোচ্চারে ঘোষিত হয়নি। দুই. মাতৃভূমির সেবা করা।

আসলে জীবনের গু(তর আঘাতে কল্যাণী বুঝেছিল, দেশ কখনো বি(াসঘাতকতা করে না। আদর্শকে ঠিকমত রূপ দিতে পারলে, তা বাস্তবায়িত হয়। এ গল্পে নায়ক অনুপম ট্রেনের সহযাত্রিণী কল্যাণীর রূপ-গুণ-কণ্ঠ এবং ব্যক্তি(ত্বমুগ্ধ হয়, তাকে বিয়েও করতে চায়। বলা যায়, বিয়ে করতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। বাবা, শম্ভুনাথবাবু এখন আর অরাজি নয়, কিন্তু কল্যাণী রাজী হয় না। কল্যাণী যেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রে'র গল্পের নায়িকা অনীতা, (যবনিকা) যার মন মরে গেছে। না বলা বোধহয় একটু ভুল হল, বিবাহ সম্পর্কে তার মন মরে গেছে।

কিন্তু তাই বলে সে নিভে যায়নি, 'নারী' প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন, যে পু(ষতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতি রক্ত(পাত, যুদ্ধবিগ্রহ অর্থাৎ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে। আগামী দিনে সমাজের নেতৃত্ব যদি নারী পায়, তবে তা হবে সহযোগিতামূলক সামাজিক অগ্রগতির নেতৃত্বাধীন সমাজ। তাই 'জায়গা আছে' শব্দটি উচ্চারিত হয় 'অপরিচিতা'র কল্যাণীর কাছে।

কল্যাণী এক নতুন আলোকমালা--আদর্শের দীপ। নারীকে কেন্দ্র করে যে আদর্শ আরো পরিস্ফুট হল 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলিতে।

মুক্ত(মনা নারী

'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ চিন্তাসূত্র আছে। এই সাধারণ বা জেনারেল ভাবনা-চিন্তাগুলিকে সঙ্গে করেই এই গল্প তিনটি তিনসঙ্গী হয়ে উঠেছে।

যেমন এক. ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক সামাজিক স্বাধীনতা তথা মুক্তি(র চিন্তা। দুই. আগামী দিনের জীবনে বিজ্ঞানের বিশেষ গু(ত্ব। তিন. কলা ও বিজ্ঞানের সমবায়ে জীবনের পূর্ণতা। চার. সতীত্ব সম্পর্কে নারীর প্রাগৈতিহাসিক মনোভাব, ভয়-এর পৃষ্ঠপটে সাম্প্রতিক নারীর ব্যথা।

যেমন নারী সম্পর্কে নতুন চিন্তা আমাদের বিশেষত আলোচিত। 'রবিবার' গল্পে বিভার একমুখী প্রেমের পাশাপাশি অভীকের বহুনারীকে সঙ্গদানের উৎসাহ যেমন আছে, তেমনই আছে, তার কাছে বহু নারী থাকলেও রাণী বিভাই। এখানে 'রাণী' ও 'নারী' শব্দদুটির ব্যবহার পার্থক্য ল(্য করা যায়। বিভা ও অভীকের এই দুই ধরনের জীবনচর্যায় কি মূলতঃ 'পলিগামি'তে বি(াসী পু(ষ ও 'মনোগামি'তে বি(াসী নারীর ছবি ফুটে ওঠে?

'শেষকথা' গল্পে অচিরা নবীনমাধবকে বিয়ে করতে পারল না, কারণ সে প্রবৃত্তিতাড়িত জান্তবতা থেকে উত্তীর্ণ হতে চাইল। 'মানুষের ধর্ম' বা 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ মালায় রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন, এই সেদিন পর্যন্ত ভবতোষ নামে অন্য একটি পু(ষকে সে ভালোবেসেছে, হঠাৎ নবীনমাধবকে ভালোবেসে চিন্তাশূন্য ভাবে ভেসে যাবে সে। এই কি মানুষের ধর্ম? নাকি, এই জঙ্গুলে পরিবেশের আদিমতাই . তাকে এ রকম প্রবৃত্তিতাড়িত করে তুলল? আলোকপ্রাপ্তা নারী হিসাবে অভীকের কাছে বিভা যে প্র(্ তুলেছে নবীনমাধবের আকুল মিলনাকাঙ্খার পরেও সেই প্র(্ অচিরা তুলে ধরেছে নিজের কাছে।

আর 'ল্যাবরেটরি'র নারীর নারী মুক্তি(র এই তিনটি গল্পের শেষধাপ, সর্বোত্তম বটে। 'শেষ কথা' গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন মুক্তি(সম্পূর্ণভাবে।ঘটেনি। শিকল হলেও পায়ে তখনও লেগে অছে তার কয়েক টুকরো। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে শিকলের শেষ চিহ্(ও নেই। প্রথমত, সোহিনীর মধ্যেই প্রথম যথার্থ সহধর্মিনীরূপের ছবি ভেসে উঠল। তাছাড়া সোহিনী হচ্ছে সেই নারী, যে তার স্বামীর জ্ঞানের মূল্য বুঝেছিল, বুঝেছিল নন্দকিশোরের প্রাণ তার ল্যাবরেটরি, সে যে উপায়েই অর্থ রোজগার হোক না কেন--সেই ল্যাবরেটরিকে র(ার জন্যে সোহিনী নিজেকে বলি দেয় না, তবে প্রচলিত সতীত্বকে বিসর্জন দেয়। তাছাড়া সোহিনী তার মেয়ে নীলাকেও ভরসা করতে পারে না, কারণ নীলা হল উগ্র আধুনিক সমাজের উগ্রতার প্রতীক যে কেবল অর্থ বোঝে, কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়ার মূল্য বোঝে না। সোহিনী 'ল্যাবরেটরীতে গল্পে নতুন এক আইডিয়াল বা আদর্শ, যে নতুন যুগের নারীর চেহারা ও চরিত্রকে বহন করবে। এবং সোহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকেই বহন করেছেন বা বলা ভাল নারীর সামাজিক সন্ধানের সার্থকতম একটা মাত্রা বা পথ দেখতে পেয়েছেন এবং দেখাতে পেরেছেন। সোহিনী যেন তরবারির ঝকঝকে রূপ, যার মধ্যে রয়েছেন ক্যারেকটারের তেজ, সঠিক পথটুকু যে চেনে এবং তা র(া করতে জানে, তার জন্যে প্রাণ বলি পর্যন্ত দিতে পারি।

সোহিনীর মধ্যে নতুন দিনের নারীর বেশ কয়েকটা পূর্বাভাস দেখা যায়। যা আলোচনা করা হল এবার গল্পটিকে ধরে।

ল্যাবরেটরি (১৩৪৭)

'ল্যাবরেটরি' গল্পে রয়েছে নারীর স্বাধীন বিকাশশীল মন স্বামীর সঙ্গে 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনীর মিল ছিল কর্মজগতের একাত্মতায়। নন্দকিশোর বলতেন 'আমি অসবর্ণ বিবাহ পছন্দ করি নে।'

সবাই বলত 'সে কি হে।'

নন্দকিশোরের মতে, 'পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।' নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দেয়। সোহিনীর এক মেয়ে ছিল, নাম নীলা। সেও বিধবা। সোহিনী নীলার তলেতলে পাত্র অনুসন্ধানও করতে লাগল। কিন্তু সোহিনীর ল(্য ছিল স্বামীর ল্যাবরেটরিও র(া করা। নন্দকিশোর বলতেন--স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার--স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। 'পতিব্রতা' শব্দের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন নন্দকিশোর--পতির ব্রত অনুসরণকারীকে তিনি পতিব্রতা বলতেন। নন্দকিশোরের মতই হয়ে উঠেছিল সোহিনী--ভেতরে ঝকঝক করছিল 'ক্যারেকটারের তেজ।' বোঝা যায়--'ও নিজের দাম নিজে জানে। নন্দকিশোর বলেছিল--'ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছাড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি।' জাত মিলিয়ে নেওয়ার অর্থ ছিল একই কাজে দুজনের আত্মসমর্পণ। বা কাজের প্রতি ভালবাসায় বা একই আদর্শের প্রতি ভালসবাসায় এক জায়গায় হওয়া। নন্দকিশোর ছিলেন লন্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়ার।

যদিও ধারণাটা সাধারণ সমাজে এরকম ছিল না। সাধারণ সমাজ--'স্বামীর একটি মাংসল পুতুল হওয়াকেই তাঁরা মনে করেন নারীজীবনের সার্থকতা। স্বামী যদি ভাতকাপড় দেয়, তার ওপর দেয় লিপস্টিক নখপালিশ ইত্যাদি, এবং আর বিয়ে না করে, করলেও অনুমতি নিয়ে করে, বা তালাক না দিয়ে চার স্ত্রীকেই দেখে 'সমান চোখে', তাহলেই নারী কল্যাণপিপাসুরা পরিতৃপ্ত, ও তাঁদের আন্দোলন সফল ভেবে ধন্য বোধ করেন। তাঁরা আসলে পু(ষতন্ত্রের শিকার(তাঁরা নারী দেখতে চান স্বচ্ছল দাসীরূপে।' [হুমায়ুন আজাদ, *নারী* (অবতরণিকা), আগামী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ ও ৩য় মুদ্রণ ১৪০৭, ঢাকা, ১৫ পাতা]।

সোহিনী খোঁজ পেল রেবতী ভট্টাচার্য সায়ান্সের ডাক্ত(ার পদবীতে চড়ে বসেছে। 'মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছুদিন চায়ের সঙ্গে (টিটোস্ট, অমলেট, কখনো বা ইলিশমাছের ডিমর বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে।' সেহিনীর কাছে কাজ আদায় বড় কথা। তাও নিজের সাধারণ স্বার্থসিদ্ধি নয়--ল্যাবরেটরি র(া করার জন্য তার এই সংগ্রাম। উকিলপাড়ায় এর আগে সোহিনী বিস্তার করেছিল, নিজের রূপমোহজাল--নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর সম্পত্তি র(ার তাগিদে। রেবতীকে তার প্রয়োজন ল্যাবরেটরিকে পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে। প্রথমে খাইয়ে খাইয়ে তাকে বশ করে আসল কথাটা তোলে--সোহিনী বলে,

'জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।' সোহিনী জানায়, সে নাস্তিক। জানায় মানুষের মত মানুষ যদি সে পায়, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চায় সে, যতদূর তার সাধ্য আছে। এই হল তার ধর্মকর্ম।

অধ্যাপক মানুষ খুশি হয় আদর্শবাদী সোহিনীর সংলাপ শুনে--'টাকা যে মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে , আমরা কী করতে আছি যদি থলি ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।'

সোহিনী আশা করে, রেবতীকে। অধ্যাপক জানান যে, শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে ওর কুষ্ঠি দখল করে বসে আছে। এবং জানান, মেট্রিয়ার্কল সমাজের কথা--যেখানে মেয়েরাই হচ্ছে পু(ষের সেরা। কিন্তু সোহিনী জানায়--তলায় তলায় ঢেউ খেলে হয়তো, ঘুলিয়ে দেয় বুদ্ধিসুদ্ধি, কিন্তু হাল যে একলা পু(ষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়।

(ে ত্র গুপ্ত লিখেছেন 'লেখক সোহিনীকে অসামান্য করে তুলেছেন তার চারিত্রিক স্খলনে, যার থেকে প্রৌঢ়ত্বেও তার উদ্ধার নেই, উদ্ধার সে চায়ওনি, আর তার জন্য নেই কোন বিবেক দংশন। নিজের পাপের কথা সে বারবার বলেছে, তার মধ্যে অনুশোচনা নেই। সুযোগ এলে, যোগ্য পাত্র যদি আসে জীবনে, অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই পারে, আর সত্যিকার ঘটেওছে।' /(ে ত্র গুপ্ত, রবীন্দ্রগল্প-অন্য রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থনিলয়, ২য় সংস্করণ ১৩৯৮, কলকাতা, ২৫৪ পাতা/।

'জাপানযাত্রী'র পত্র'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'মানুষের মনে বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ র(া করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ(এই মেয়েটির মধ্যে আমরাই তার পরিচয় তারপর, কর্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পু(ষ স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হয়। মেয়েদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য আছে যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কর্মতৎপরতা। কর্মে সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য করতে পারে তা নয়, তাতে ওরা আনন্দ পায়। /*রবীন্দ্ররচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, (জাপানযাত্রী), বি(ভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী উপল(ে ২য় সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, ৪১৩ পাতা/।

তপোব্রত ঘোষ লিখেছেন, 'তিনসঙ্গী'র সবচেয়ে আশ্চর্য সুন্দর নাম 'সোহিনী'। সংস্কৃত 'শোভিনী' হিন্দুস্থানীতে 'সোহিনী'। সোহিনী পশ্চিমভারতের মেয়ে। 'সোহিনী'র অন্য অর্থ 'মনোমোহিনী' 'মনোহারিণী'। /তপোব্রত ঘোষ, *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৭, কলকাতা, ৩৮৪ পাতা/।

সোহিনী একটা রাগ সঙ্গীতের রাগ, গভীর রাতের গভীর রাগ। যাকেবল মনোহরণ করে না। রেবতীকে পাবার জন্যে কন্যা নীলাকে সাজায় এমন ভাবে, রেবতী ল্যাবরেটরি কাজে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে না। সোহিনী কন্যা নীলাকে সাজায়, কিন্তু. দূরে সরিয়ে রাখে বা রাখতে চায়। নীলা ছিল বিবাহিতা, বিধবা, 'মা দেখতে পায় মেয়ের ছটফটানি'--তাই রেবতীকে কাছে টানবার কৌশলে নীলাকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু নীলাকে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না।

সোহিনী পণ করে--একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর একটা তাকে ডাঙায় টেনে তুলবে। সোহিনী তার স্বামীর বিদ্যায় মজেছিল--নন্দকিশোরের চরিত্রে সোহিনী কোনদিন খাদ দেখতে পায়নি। 'উনি বিদ্বান ছিলেন বলে নয়, বিদ্যার পরে নিষ্কাম ভক্তি(ছিল বলেই' সোহিনীর ভাল লাগত ওকে। সোহিনী জানায় 'আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা।' তাছাড়া গোড়াতেই সে নাম ডুবিয়েছে, সত্যি বলতে তার বাধে না। স্বামীর ছাত্রের দল সোহিনীর আশেপাশে যাদের গতায়াত ছিল--মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুনে ঢাকা লোভী মন দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল সোহিনীর। গায়ে দাগ লাগলেও সোহিনীর মনে ছোপ লাগেনি--জমা পাপ একে একে জ্বলে ল্যাবরেটরি'র আগুনে পরিণত হয়েছে। সে জানায়--'আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে প'ড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সা তারা খসাতে পারেনি। আমার প্রাণ শক্ত(পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভান্ডারের দ্বার।' সোহিনীর কাছে সতীত্বের সংস্কার নয়, বড় হল আদর্শের সংস্কার। কাজ উদ্ধারের জন্যে অধ্যাপককে ডেকে আনা এবং চুম্বন করতে তার বাধে না।

সোহিনী প্রণাম করল রেবতীকে। বলল আমার গু(বলেছেন, এখনকার কালের সবসেরা যে বিদ্যা তাতেই যাঁর দখল তিনিই

সেরা ব্রাহ্মণ।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্বের এই তিনটি গল্পে দেখিয়েছেন, কিভাবে বিজ্ঞান যুগকে অধিকার করেছে। এখন আর আর্টের যুগ নয়, যুক্তি(শৃঙ্খলার যুগ। সোহিনী তার স্বামীকে সন্দেহ করত, কারণ তাঁর চরিত্রে যে দাগ ছিল, স্বামীর চরিত্রেও তা অনুমান না করে থাকতে পারত না। সোহিনী রেবতীকে অবাক করে দেয় প্রথমত বিজ্ঞানচর্চার জ্ঞান মিলিয়ে দিল, আর্ট পিপাসু হৃদয়। বিভিন্ন খাবার দেওয়া হল এবং বলা হল, এ সমস্ত নীলার হাতে তৈরি।

সোহিনী সম্পর্কে ড. (ে ত্র গুপ্ত বলেছেন--'সোহিনী রূপে নয় তী(বুদ্ধি দিয়ে নন্দকিশোরের মনে ঢুকে পড়েছিল। সোহিনী যেমন স্বামীকে, নন্দকিশোরও স্ত্রীকে পুরো বুঝেছিল। স্বামীর পাপের উপার্জন, স্ত্রীর নীতিভাঙ্গা যৌনতা পরস্পর মেনে নিয়েছিল--কোন যৌথ স্বার্থমুখী চত্র(তৈরির জন্য নয়(একে অন্যের মধ্যে অসাধারণ শক্তি(ও গুনের যে খোঁজ পেয়েছিল সে কারণেই।' /(ে ত্র গুপ্ত, রবীন্দ্র গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থ নিলয়, প্রথম প্রকাশ ১৩৯১, কলকাতা(২৫২ পাতা/।

সোহিনী তার বুদ্ধির জোরেই ল্যাবরেটরি বাঁচিয়েছিল। সোহিনীর ছুরি চাতুর্য-ব্যক্তি(ত্বে, আর্থিক শক্তি(তে আর প্রৌঢ় রূপের ঝিলিকে। সোহিনী তাকে কাছে এনে আর পরী(া নিরী(া করল। চা আনাল তেতো, আগের মত গুচ্ছের খাবার নেই। নীলার বদলে মুসলমান খানসামা আনল চা। রেবতীর দ্বিধা দেখা পেল। সোহিনী দ্বিধাটা দেখতে চেয়েছিল। ভাঙতে চেয়েছিল প্রচলিতকে।

সোহিনী স্পষ্ট। তেজস্বী, স্বামীর গলাতেও সে একমাত্র ঝুলতে পারে--তার ভেতরের রত্ন কেবল নন্দকিশোরই বুঝেছিল। সোহিনী জানায় তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন, সে আজ পর্যন্ত টিকে আছে আমার শেষদিন পর্যন্ত থাকবে।' আর সে কারণেই স্বামীর আদর্শের লাইব্রেরিতে আনেন রেবতীকে। কন্যাকে বলেন, 'কোনোমতেই তুই রেবতীর ঘেঁষতে পাবি নে। আর কোনো ছুতোতেই ঢুকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।' ল্যাবরেটরি বাঁচানোর জন্যে বদ্ধপরিকর সোহিনী--জানায়, 'আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নকাটি করিনে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।

কিন্তু সোহিনী শঙ্কিত হয় নিজের কন্যাকে দেখে। চৌধুরীমশায়কে বলে, 'মজুমদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগুক, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে' কারণ সোহিনী জানে সায়েন্সে সে যত পন্ডিতই হোক, যাকে মেট্রিয়ার্কি বলে, যে সমাজে রেবতী ঘোর আনাড়ি।'

সোহিনীর ল(্য ছিল ল্যাবরেটরি র(া করা। প্রাণপণে সে র(া করে এসেছে ল্যাবরেটরি। কিন্তু তার আইমা'র অসুস্থতার জন্যে তাকে যেতে হয় আম্বালায়। আর সেই সুযোগ কাজে লাগায় কন্যালীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের সেমিজ পরে এ যুগের ঋষির ধ্যান ভাঙাতে আসে এ যুগের অপ্সরী উর্বশী। ধ্যান ভাঙল--প্রহরী এসে ভৎর্সনা করলেও, রেবতীর মাথায় 'নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মত অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না। 'রেবতী যতই ভাবল--কাল চায়ের নেমন্তন্নে যাবে না, ততই কোন বিদ্যুৎবর্ষণ প্রবেশ করল ওর শিরায় শিরায়।' চকিত হয়ে বেড়ায় অগ্নিধারায়। নীলা আবার এল। তাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে গেল জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্টের পদে। দারোয়ান এসে হুঙ্কার দিল। জ্বালাময় মদ ঢেলে দিল নীলা। নীলার জেদ তার মায়ের বি(দ্ধে। রেবতীর আসল কাজ গেল বন্ধ হয়ে।

সোহিনী এসে জানিয়ে দিল, নীলা তার কন্যা নয়। রেবতীকে যদি বিয়ে করতে হয়, তা যেন ল্যাবরেটরি থেকে শতহস্তে দূরে হয়। আর সোহিনী এও বলল, রেবতীর ইন্দ্রপতন দেখে--

'আমি লোক চিনতে পারিনি(কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়াল ঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম--গোবরের কুন্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।'

সোহিনী কাছে আদর্শই ছিল বড়। সে সত্য বলে--মিথ্যা তাকে আদর্শের কারণেই বলতে হয়। সে তার স্বামীর আদর্শকে প্রাণপণে র(া করে--স্বামীকে শ্রদ্ধা করে সে। দুজনের কাছে দুজনে সত্য--আদর্শটাই তার বড়। নন্দকিশোর তাকে সঠিকভাবে গড়ে তুলেছিলেন, তাকে ছেড়ে যাননি, বিজ্ঞানের সাধনায় নিজেকে মগ্ন রেখেছেন--পাপ কাজে ব্রতী হয়ে। সোহিনীকে তিনি নিজধর্মে সঠিকভাবে দী(ত করেছেন--সোহিনী তার মূল্য দিয়েছে। নিজের কন্যা নয় ল্যাবরেটরি তার কাছে বড়--সোহিনী তাই বলতে পারে--'রাজকন্যা মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে রাজত্ব সস্তায় বিকোবে না।'

সোহিনী তার রাজত্বকে র(া করে বাঁচার তার আদর্শকে। প্রতিমা দেবী 'নির্বাণ'-এ লিখেছেন ঃ 'সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ কেউ আলোচনা করতেন (রবীন্দ্রনাথ) তাঁদের প্রায়ই বলতেন, 'সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজম, অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়াইজমই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।' /প্রতিমা দেবী, নির্বাণ, সূত্র গল্পগুচ্ছ ৪র্থ খণ্ড, বি(্বভারতী, গ্রন্থপরিচয়, ১০২২ পাতা/ ।

আবার শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লেখেন--'ল্যাবরেটরি নামে গল্প যখন প্রথম ছাপা হয়.....আমি /শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ/ যেতেই /কবি/ গল্পটা দেখিয়ে বললেন...'আর সকলে কী বলছে? একেবারে ছি ছি কান্ড তো? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না! আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে-- সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে। সবাই তো এই বলবে যে, এটা লেখা ওঁর উচিত হয়নি?' একটু হেসে বললেন, 'আমি ইচ্ছা করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটা কিরকম, তার মনের জোর, তার লয়াল্‌টি, এই হল আসলে বড়ো কথা--তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজ চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। /সূত্র গল্পগুচ্ছ, ৪র্থ খণ্ড, ((প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, কবিকথা, বি(্বভারতী পত্রিকা, (গ্রন্থপরিচয়) কার্তিক-পৌষ ১৩৫০)), বি(্বভারতী, কলকাতা, ১০২৩ পাতা/ ।

সোহিনী আলোকপ্রাপ্তা নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ঔজ্জ্বল্যে। তার কাছে কাজটাই আসল, চরিত্রধর্ম নয়--বা এও বলা যায় নোংরা জীবনের সংস্পর্শে থাকা সোহিনী বুঝেছে জীবনের আদর্শকে গ্রহণ করাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় পর্ব। মাঝে মাঝে পাপ এসে উঁকি মারে, কিন্তু তার কাছে ল্যাবরেটরি র(া বড় হয়ে দেখা যায়।

রবিবার (১৩৪৬)

এ গল্পের নায়ক অস্থিরচিত্ত--একাধিক নারীসঙ্গ লোভী--তা বলতে বাধে না, বিভাকে, যাকে সে ভালবাসে। এই হিসাবে সৎ। অবশ্য অভীকের দুটো সখ ছিল, এক. কারখানায় জোড়াতাড়া দেওয়া। দুই. ছবি-আঁকা। অভীক নিজের নামকে বদল করে ফেলেছিল। অভীকের শিষ্যার অভাব হয়নি কোন। বিভা ছিল এই দলের বাইরে। ব্রাহ্মসমাজে মানুষ হয়ে পু(ষদের সঙ্গে মেশবার সংকোচ তার ছিল না। বিভার র(াকর্তা হয়ে উঠল অভীক। বিভা লোকের কানাকানিতে সংকোচ বোধ করেছে, আবার তাতে, আনন্দও পেয়েছে প্রচুর। বিভা ভাবত--অভীক তাকে ভালবেসে ধন্য করছে। অভীকের ছিল ভালবাসার স্পষ্টতা-- লুকোছাপা ছিল না চরিত্রের কোন দিকে। অভীক এ যুগের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল--যাদের কাজ যন্ত্র ও শিল্প উভয় নিয়েই। তাই যুগকে যে গ্রাস করেছে তাকে আদর্শ করা বিভার কাছে স্বাভাবিক। 'একদা কলেজের পরী(ায় বিভা অভীককে ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে তার অজস্র কান্না আর বিষম রাগ। এ যেন তার নিজের অপমান।' গদগদস্বরে বিভা অভীককে বলেছিল--'তুমি দিনরাত ছবি এঁকে এঁকে পরী(ায় পিছিয়ে পড়, আমার লজ্জা করে।' বিভা ছিল সেই দলের মেয়ে, যারা মনে করে পু(ষ হবে নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ। বিভা সেই দলের নয়, যে মনে করে--

> 'আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধে তারা ওঠা
> মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।' /রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, (পলাতকা, মুক্তি()বি(্বভারতী, পুর্নমুদ্রণ ১৪০২, কলকাতা, ৫৫৫ পাতা/ ।

বিভা অভীকের ছবি বুঝতে পারত না। আর প্রশংসাও করত না। অভীকের মন ছটফট করত, বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। 'কেবলই এই কল্পনা মনে জাগে যে, 'একদিন য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।'

শুধু তাই নয়, বিভা এখনও উপে(া করতে পারেনি ধর্মকে। অভীক নাস্তিক। কিন্তু অভীক বলে--'তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বি(্বাস কর, আমি তাকে করিনে বুদ্ধি আছে বলে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই, তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বি(্বাস কর না কেন। তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পার না।'

আসল কথা অভীক ছিল ত্যাজ্যপুত্রও। অভীকের প্রয়োজন ছিল অর্থের। অভীকের দ্বিধা হয় না মনীষার ঘড়ি বিক্রি(করতে, কারণ

ত্র(াইসলার গাড়ি তার চাই। তার জন্যে লাগবে আটশো টাকা। আর তার নীতিবোধও নেই। সে হল তাদের একজন যারা দুর্দাম দুরন্ত, কোনো বালাই নেই ন্যায়- অন্যায়ের, তাই 'মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে।' বিভাকে বলতে বাধে না, শীলাকে নিয়ে গাড়িতে ঘুরতে যাবার কথা। বিভা অবশ্য এসব সূক্ষ্ম ঈর্ষায় যেতে রাজি হয় না। বিভা জানায়--'আমাকে এর মধ্যে টান কেন। বিধাতা তো আমার রূপ নিয়ে তো খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেননি। আর আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়িখানার উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয়।' ধন্য হয়ে যায় অভীক--'কার সঙ্গে কথা তুলনা। আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি, তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আমার ভয় হয় কোনদিন ফস্ করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনো কালে আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার ঈর্ষা আমি কিছুতেই জাগাতে পারলুম না।'

বিভা নিজেকে জানে। জানে বলেই সে বলতে পারে, তাকে যখন অভীকের প্রয়োজন হবে না, তখন তাকে আবিষ্কার করতে পারবে। অভীক দূরে গেলেই তবে করতে পারবে আবিষ্কার। বিভা অভীকের সহধর্মিনী হতে চায় না--কারণ শিল্পের পথে বাধা বলে। বিভা ত্র(াইসলারের ঐ(র্যকে মানে না, কারণ তাতে পু(ষ মানুষকে ছোট করা হয়।

বিভা ভালবাসার সংকীর্ণতায় বি(াসী নয়। বিভা নতুন এক সৃষ্টি--বলা যায়, নতুন আলোকমালার সন্ধানী। 'ঋকবেদের যুগে পু(ষের পাশে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নারী। সভ্যতার এ পর্যায়ে রাজনৈতিক সম্প্রসারণ ছিল বড় কথা। গোষ্ঠীচেতনা তখন বৃহত্তর সমাজচেতনার দিকে যাত্রা করেছে। সেখানে বৈধ-অবৈধ সূক্ষ্ম বিভাজনের চেয়ে চলার বেগটাই বড়। এ যুগে ধর্মপরিবার ও সমাজকে সম্পূর্ণরূপে অতিত্র(ম করেনি। পুণ্যবানের জন্য স্বর্গ ও পাপীর জন্য নরক তখনও রচিত হয়নি। নারী পু(ষের মিলনে কোন সংস্কারকে প্রাধান্য দেওয়ার চেয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ ও প্রজাবৃদ্ধির উপায় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।' /ডঃ জ্ঞানেশ মৈত্র, নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, (ভারতীয় সাহিত্য ঃ নারীর অধিকার ও কর্তব্য), ন্যাশনাল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৪, কলকাতা, ২ পাতা/।

বিভা অভীককে বলে, 'তোমার দুষ্টুমি কত(ণের। এটা সাংঘাতিক শীলার প(ে, তোমার প(ে একটুও না। এমন ছেলেমানুষি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছুদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরো অচল হয়। হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পার না।'

স্বীকৃতি দেয় বিভাকে অভীক, 'তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত(মনের সব চেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।'

বিভা ট্রাস্টির টাকা দিয়ে দিতে পারে সসংকোচে অভীককে। বিভা বি(াস করে অভীকের প্রতিভাকে। বিভা অভীককে যে টাকা এনে দিয়েছিল তা অন্ধ আবেগে মরীয়া হয়ে। মেয়েদের জীবনে নিয়মের প্রবল ব্যতিত্র(মের ঝটকা হঠাৎ কোন দিক থেকে এসে পড়ে, তিনি বিষয়ী লোক সেটা কল্পনাও করতে পারেননি। অন্যদিকে বিভার অধ্যাপক অমরবাবুও কোপেনহেগেনে সর্বজাতিক ম্যাথামেটিকস্ কনফারেন্সে যোগ দেবেন। বিভা পড়ার জন্যে মামার দেওয়া ট্রাস্টি থেকে টাকা অভীককে দিতে গেছিল। অভীক তা নেয়নি। প্রত্যাখ্যাত সেই দান আর দিতে ইচ্ছে হল না। মায়ের কিছু গয়না ছিল বিভার কাছে--প্রথমে গয়নাগুলো লুকোতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছু অভীকের কাছে চাপা দেবে--সে ওর স্বভাববি(দ্ধ। অভীক গয়না দেখল, দেখে জানাল, বিধবা বুড়ির টাকা মেরে দুর্গা পূজার আয়োজন করছিল তার চেলারা, সে টাকা অভীক দান করে দিয়েছে অমরবাবুকে, বিদেশযাত্রার জন্য।। আর তারপর বিভর অনুপস্থিতিতে হার নিয়ে উধাও হল। বিভ্র চিন্তিত দীর্ঘদিন অভীকের কোন সংবাদ না পেয়ে। এমন সময় চিঠি এল অভীকের। সে লিখেছে--'তুমি আমার মন ভোলানোর জন্য কৃত্রিম স্তব করনি। তোমার চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় দুঃখ পেয়েছি, তবু সেই সত্যকে দিয়েছি আমি বড়ো মূল্য। তোমার কাছ থেকে চলে আসার দা(ণ দুঃখ যেন একদিন সার্থক হয়। মেয়েদের আমার ভালোলাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে--সেই ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞ করে।'

গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী লিখেছেন--'সুন্দরের মধ্যে সুন্দর হচ্ছে প্রেম। প্রেমে ছেদ নাই (য় নাই প্রেম চিরযৌবনা, এই জ্যোৎস্না, লাবণ্যময়ী, বিচিত্রপত্র পুষ্পাভরনা সুনীল নীরদ কুন্তলা ধরণীরও একদিন বার্দ্ধক্য আসিবে কিন্তু প্রেমের শিশুত্ব কল্পনায় আসেনা, প্রেম কখনও বুড়াও হইবে না।' /গিরিন্দ্রমোহন দাসীর গদ্যসংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী (বিবিধ প্রসঙ্গ -তৃপ্তি), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭, কলকাতা, ৩ পাতা/।

অভীক বিভাকে মনে করে সে 'সত্য' আভাস নয় । মনে করে বিভা 'ধ্রুব ন(ত্র'। অভীকের মতে, আর সকলে আলো, বিভা তারা। বিভার মধ্যে রয়েছে মা ও প্রেমিকা সত্তা, অন্যদের মধ্যে আছে মোহিনী-প্রেমিকা সত্তা।

তীব্র অতৃপ্তি অভীককে ক্লান্ত করে--জানায় জগতে সবথেকে ভালোবাসার মানুষ বিভা। একদিন অভীক বিভাকে পেতে চেয়েছিল বুদ্ধি দিয়ে, এবার সে পেতে চায় তার সমস্ত দিয়ে।

এই সমস্ত তার *'whole existence'* যাকে বলা হয় সত্তা। পু(ষের জীবনে অনেক কিছুর একটি দিক প্রেম, কিন্তু নারীর কাছে প্রেম সমগ্র সত্তা। সমস্ত সত্তায় তার বিচরণ--এরই সন্ধানে অভীকের যাত্রা। বিভা বুদ্ধিমতী--তাই অভীককে পালাতে দেয় কারণ তার বন্ধন সুরটুকু বিভার মধ্যেই স্পষ্ট। যেমন 'শেষকথা'র অচিরা এ সমস্তকে উপে(া করে এবং আদর্শ হিসাবে বেছে নেয় কাজকে।

শেষকথা (১৩৪৬)

'শেষকথা'র বিষয় বিজ্ঞানের সাধনা। এ গল্পের নায়ক আসলে সময়। এ গল্পে নবীনমাধব খনিজবিদ্যা শিখেছে। ভালবাসা সম্পর্কে তার মত হল--'মেয়েদের ভালোবাসা নিয়ে যারা অহংকারের বিষয় করে, আমি তাদের অবজ্ঞা করি।' কিন্তু অচিরাকে দেখার পর নবীনমাধবের পাহাড়ের মতো খট্‌খটে, নিরেট মনের ভেতর থেকে উছলে পড়ল ঝরণা।

অচিরা ভালবাসত--ভবতোষ মজুমদারকে। সে করেছে বি(্বাসঘাতকতা, সে এখন 'ইন্ডিয়া গবর্মেন্টে'র উচ্চপদস্থ একজন মু(ব্বির মেয়েকে বিয়ে করেছে। পাথেয় আর খরচ জুগিয়েছিলেন অচিরার অধ্যাপক দাদু। এ গল্পে দাদু ও নাতনি সম্পর্কে একটা গভীর টানের পরিচয় পাই। নবীনমাধব সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এদের। দাদু একে নেমন্তন্ন করলে নাতনি অচিরা বাধা দেয়--'যখন তখন নেমন্তন্ন করে তুমি আমাকে মুশকিলে ফেল।' অচিরা এড়িয়ে যেতে চায় একে। অচিরার দাদু অচিরাকে তুলে ধরতে চায় এই বলে--'আমার দিদি কিন্তু কথা কইতে জানে, অমন কাউকে দেখেনি।' অচিরা জানায়,'তুমি আমার মত এমন কাউকে দেখনি দাদু, আমিও কাউকে দেখিনি তোমার মতো।' অচিরা বাড়ি ফেরার পথে বলে, 'এইবার আপনি ফিরে যান বাসায়।' অচিরা বাইরের লোকেদেরও জানিয়ে দিতে চায়, সে দাদু'র চেয়ে বেশি আর কাউকেও ভালবাসবে না।

ইতিমধ্যে অচিরার খবর পেয়ে গেছে নবীনমাধব সেনগুপ্ত--সে যতই মিশতে চায়, অচিরা ততই দেয় বাধা। অচিরা বলেছিল--'আমাদের দেশে মেয়েদের আপনারা পান সংসারের সঙ্গিনীরূপে। সংসারে যাদের দরকার নেই, এদেশের মেয়েরাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। কিন্তু বিলেতে যারা বিজ্ঞানী, তপস্বী, তাদের তো উপযুক্ত(তপস্বিনী জোটে, যেমন ছিল অধ্যাপক কুরির সহধর্মিনী মাদাম কুরি।'

রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে, 'স্ত্রী বিশেষ স্বাধীনতার উপযোগী কিন্তু সকল স্ত্রী নহে। যাঁহারা বলপূর্বক সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা জমাইয়া দিতে চান, তাঁহারা যতই স্ফীত হউক না কেন, তাঁহাদিগকে সমাজের গাত্রে একটি সুমহৎ (ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।' /রবীন্দ্ররচনাবলী, (সমালোচনা--সমস্যা), পঞ্চদশ খণ্ড, বি(্বভারতী, রবীন্দ্রজন্ম উপল(ে প্রথম প্রকাশ ১৩৯৮, বর্তমান সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, ১১৩ পাতা/

রবীন্দ্রনাথ তার গল্পে দ্বিধাকে এড়াতে পারেননি। কিন্তু বিদেশিরা হয়তো অন্যরকম। আবার সব (ে ত্রে যে কাজের মধ্যেই সম্পর্ক জোড়ে তা নয়--আসল বন্ধন বি(্বাসের, মনের, একনিষ্ঠতার সম্বন্ধের। নবীনমাধব কথা প্রসঙ্গে স্বীকার করে ক্যাথরিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। বিয়ের প্রস্তাবও এসেছিল। কিন্তু নবীনমাধব বিয়ে করেনি তার কারণ তাঁর কাজ ভারতবর্ষে, তার সাধনা খনিজবিদ্যার। বিজ্ঞানের। এ শুনে অচিরা'র বক্ত(ব্য--'মেয়েদের জীবনের চরম ল(্য ব্যক্তি(গত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তি(ক।'

কিন্তু পরবর্তীকালে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে বন্ধুত্বপর্বে রবীন্দ্রনাথ বদলেছেন নিজেকে। অমিয় চক্র(বর্তীকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন ঃ 'বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তি(ত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যার্থাথ্যে নয়।' /রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, (সাহিত্যের পথে কবি অমিয় চক্র(বর্তীকে লেখা চিঠি) বি(্বভারতী, ৪২১ পাতা/

১৯২৫ সাল, ১৩ই জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ লেখেন--'মনটা প্রায়ই গৃহকাতর হয়ে ওঠে(সে যে কেবল দেশের জন্য তা নয়। সে

আমার ভিতরকার সত্যে পৌঁছবার জন্য, যে সত্য থেকে মেলে অন্তরতম মুক্তি। যখন কোনো কারণে মন খুব বেশি করে নিজেরই দিকে সরে আসে, তখন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এই সত্যের চেহারা। আর যখন চারপাশ থেকে আহ্বান এসে পৌঁছয় আমার কর্মোদ্যমের প্রতি, সেই পরিবেশই হয়ে ওঠে আমার যোগ্য বাসা, কেননা তা আমাকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বলোকের স্পর্শ এনে দেয়। আমার চেতনার মধ্যে এমন একটা নীড় নিশ্চয় আছে যেখানে আশ্রয় পায় বহিরাকাশ, আর আলোক এবং মুক্তির মতো এমন আর কোন্ আকর্ষণ আছে আকাশের।' [শঙ্খ ঘোষ, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, (অলিন্দ), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, কলকাতা, ৬০ পাতা]।

অচিরা তার দাদুর ছাত্রী সুযোগ্য শিষ্যা। অচিরা জানায়--কচ দেবযানীর অভিশাপের কথা। জানায় আধুনিক ইউরোপকে যদি অভিশাপ দেওয়া যেত--কচকে যেমন দেওয়া হয়েছিল সেরকম--'তোমার জ্ঞানসাধনার ধন তুমি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্যকে দান করতে পারবে।'

এ গল্পে আনলেন ইউরোপের বাণী। 'পথেয় সঞ্চয়'-এর 'দুই ইচ্ছা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--'যাহাতে মানুষের (তি করিতে পারে সে ইচ্ছা মানুষের থাকে কেন। নিজের এই দুরন্ত ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মানুষ বিশ্বব্যাপারে একটা শয়তানের কল্পনা করিয়াছে। য়িহুদি পুরাণের প্রথম নরনারী যখন স্বর্গোদ্যানে ছিল তখন ঈশ্বর তাহাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার মধ্যে বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকিয়ো। প্রাণের রাজ্যই তোমাদের রহিল, জ্ঞানের রাজ্যে লোভ দিয়ো না।' স্বর্গোদ্যানের প্রত্যেক জীবজন্তুই সেই সন্তোষের সীমার মধ্যেই বদ্ধ রহিল। কেবল মানুষই বলিল, 'যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরো পাওয়া চাই।' এই যে 'আরো'-র দিকে সে পা বাড়াইল এ বড়ো বিষম রাজ্য। এখানে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির কোনো সীমা কোথাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই, এইজন্য কোনো দিকে কত দূর পর্যন্ত যে যাওয়া যায় তাহার পরামর্শদাতা পাওয়া শক্ত। এই জন্য এই অতৃপ্তির পথহীন রাজ্যে মরিবার আশঙ্কা চারিদিকেই বিকীর্ণ। এমন ভয়ানক ক্ষেত্রে মানুষকে দুর্নিবার বেগে যে টানিয়া আনিল মানুষ তাহাকে গালি দিয়া বলিল 'শয়তান'।

কিন্তু রাগই করি আর যাই করি, জগতে শয়তানকে তো মানিতে পারি না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে, মানুষের এই যে ইচ্ছার উপরে আরো'র জন্য আরো একটা ইচ্ছা ইহা তাহার বাহিরের দিক হইতে একটা শত্রুর আক্রমণ নহে। ইহাকে মানুষ রিপু বলে বলুক, কিন্তু এই ইচ্ছাই তাহার যথার্থ মানব--স্বভাবগত ইচ্ছা। সুতরাং যতগুণ এই ইচ্ছাকে সে জয়ী করিতে না পারিবে, তত(ণ তাহার কিছুতেই শান্তি নাই--তত(ণ তাহাকে কেবল আঘাত খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে। [*রবীন্দ্ররচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, (পথের সঞ্চয়--দুই ইচ্ছা) বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২য় সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, ৬৫১ পাতা]।

বর্তমান সভ্যতা আবর্তিত প্রবৃত্তির এই বেগের দ্বারা, যার থেকে মুক্তি সে চায়ও না। তাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'রাজা' নাটকে অন্ধকার, 'চতুরঙ্গে আদিম গুহা' বলে, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই প্রবৃত্তির বেগ বলে।

অচিরা জানায়--'এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ত্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।' অচিরার এ ভয় কেন? সভ্যতাকে, যা যন্ত্রকে সে পায় ভয়। কারণ যন্ত্র নির্জীব। 'তাসের দেশ' নাটকে হরতনী বলে, 'কোন্ যুগে আমরা চলেছিলুম সেই দুর্গমে। রাত্রে ধরেছি মশাল তোমার সামনে, দিনে বয়েছি জয়ধ্বজা তোমার আগে আগে। আজ আর একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গন্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এইসব নিরর্থকের আবর্জনা। [*রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, (তাসের দেশ), বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২য় সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, ২৫১ পাতা]।

অচিরা যন্ত্রকে পছন্দ করে না। কারণ যন্ত্র সব জিনিসের স্পষ্ট মানে বুঝতে চায়। 'রক্তকরবী' নাটকে-- বিশুকে নন্দিনী জানায় রাজার কথা--'একসময় ঝেঁকে উঠে ওর বর্শাকলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল', আমি তোমাকে জানাতে চাই।' আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, 'জানবার কী আছে? আমি কি তোমার পুঁথি। সে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তারপরে কিরকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কিরকম ভালোবাসা।' আমি বললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে--পালে পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর

জন্যে প্রাণ দিতে পার?' আমি বললুম, 'এখ্খনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, 'কখ্খনো না।' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' তাতে বললে, 'কখ্খনো না।' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' তাতে তোমার লাভ কী' তাতে তোমার লাভ কী। 'বললুম, 'জানিনে।' তখন ছটফট করে বলে উঠল 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও কাজ নষ্ট কারো না।' /রবীন্দ্ররচনাবলী (রক্ত(করবী), অষ্টম খণ্ড, বি(ভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপল(২য় সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, ৩৭২ পাতা/।

অচিরা স্বীকার করে--'দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তি(তে নিজের আদর্শকে গ'ড়ে তোলে, প্রাণশক্তি(র অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তি(র আত্র(মণে।' অচিরা স্বীকার করে--নারীর কাছে 'ভালোবাসার আদর্শ' 'পূজার জিনিস'। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। অচিরার কাছে তার জীবনের প্রথম ভালোবাসা 'ইম্পার্সোনাল।' 'মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ে--যদি সে সব হারায়।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--'মেয়েরা দুই জাতের, একজাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।' ...যেহেতু প্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি পত্নীত্বে আর পত্নীত্বের চরিতার্থতা মাতৃত্বে--যে মাতৃত্বের জন্য পু(ষের সহযোগ আবশ্যিক। যদিও 'শেষ প্র(ে'র কমল বলেছে, 'প্রেমের পরিণতিতে বিবাহ--তাতে স্থায়ীত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ দায়িত্বের মোটা দাড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা করে মরে।' সমাজ সংস্কারকদের সুবিধা এই যে, কমলের আগে একথা কেউ বলেনি, পরেও না। বললে এ সমাজ টিকত না। সংসারে প্রেয়সী বা জননীরূপে নারীর যে কল্যাণীরূপ তা বারবার রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় বন্দিত হয়েছে। যেমন,

'যে জীবলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি(বহমান
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান
বি(ের পালনীশক্তি(, নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে।
মাধুরীর রূপে।' (আরোগ্য - ২৩)

জীবপালনের প্রবৃত্তিই সেই প্রবৃত্তি যা রাণীর মধ্যে বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে স্নেহে সক(ণ ধৈর্যে। (নারী ঃ কালান্তর)

'তুমি বদ্ধ স্নেহ প্রেম ক(ণার মাঝে
শুধু শুভকর্ম শুধু সেবা নিশিদিন।' (সোনার বাঁধন, সোনারতরী)

কিন্তু এইসব সপ্রশংস বাণীর বর্ণময়তার নীচে চাপা থাকে শাসনের ও বঞ্চনার ইতিহাস। সতীত্বের মাদকতায় মুগ্ধ করে মেয়েদের 'হৃদয়মাধুর্য ও সেবা নৈপুণ্যকে পু(ষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তি(গত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারার বেড়া দিয়ে রেখেছে।' /পশ্চিমবঙ্গ , (রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০৩), 'আমি নারী আমি মহীয়সী কিন্তু সতীত্ব!' দেবী মুখোপাধ্যায়, ১৯৩ পাতা/।

কিন্তু সাধনায় নৈরাশ্য এল নারীকে দেখার পর। অচিরা জানায়--তার ভিতরের 'আদিম প্রাণের শক্তি('র জাগ্রত হয়েছে প্রবৃত্তিরা(সের মাধ্যমে। দাদুর কাছে গিয়ে সে ঝর্ণায় স্নানের আনন্দ পায়। কারণ দাদুই তার আসল দী(া ও শি(া গু(। আর কর্মের আনন্দ শি(ার আনন্দই যে প্রকৃত আনন্দ তা উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ, করিয়েছেন অচিরাকে দিয়েও। সমর ভৌমিক 'রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন--

(ক) কোন ব্যক্তি(বা বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সং(ি-ষ্ট না করা।

(খ) কোন চিন্তায় সামগ্রিকভাবে আচ্ছন্ন না হয়ে পড়া।

(গ) কামনা বাসনাকে প্রলম্বিত না করা।

(ঘ) সুন্দর ও অসুন্দর বা জাগতিক জড় বা জীবিত বস্তু সম্পর্কে প্রত্য(ভাবে চেতনা সম্পন্ন হওয়া।

(ঙ) সৃষ্টি, গতি, প্রকৃতি, আরম্ভ ও বিরাম সম্পর্কে সচেতন হওয়া। /সমর ভৌমিক, *লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় জীবনালেখ্য*, দি ইউনিক বুক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ ১৪০৪, কলকাতা, ৫ পাতা/।

অচিরা দাদুকে জিগ্‌গেস করে জানতে পারে--'পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে' পড়ে। 'কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা সামনে আছে, আরো স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতা কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।'

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' এ--রবীন্দ্রস্নেহধন্যা ও লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের বাণীর যে ছবি তুলে ধরেছেন তা হল ঃ 'ভোরবেলায় আমার আকাশের মিতা যখন আমায় আলোর ধারায় স্নান করিয়ে দেয়, তখন আমি চেষ্টা করি আমার নিজের থেকে দূরে যেতে। আমাদের মধ্যে দুটো 'আমি' আছে--দুটো মানুষ, একজন লোভে, ে োভে, শোকে, দুঃখে আনন্দে, বিষাদে সর্বদাই দোদুল্যমান, আর একজন সে বড়ো 'আমি'। সে এ সমস্তের অতীত, সে স্থির, আপনাতে সম্পূর্ণ, অথচ ঢাকা পড়ে থাকে সেই বড়ো সত্তাটাই। এরই বিষয়ে আমি বলেছি, মানুষের দুটো রূপ, একটা তার বিশেষরূপ, আর একটা তার বি্বরূপ। সেই বি্বরূপেই সে অসীমের সঙ্গে এক।' /মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রাইমা পাবলিকেশনস, প্রথম ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৯৯৮, কলকাতা, ১৬২ পাতা/।

অচিরা সিদ্ধান্ত নেয়--আচার্যের সঙ্গী হওয়ার। সে দাবি জানায়, 'অত্যন্ত অহংকার না বাড়লে একথা তোমাকে মানতেই হবে, আমাকে না হলে একদিনও তোমার চলে না। আমার অনুপস্থিতিতে পনেরোই আ্বিনকে পনেরোই অক্টোবর বলে তোমার ধারণা হয়, যেদিন বাড়িতে তোমার সহযোগী অধ্যাপকের নিমন্তন্ন, সেইদিনই লাইব্রেরির ঘরে দরজা বন্ধ করে নিদা(ণ একটা ইকোয়েশন কষতে লেগে যাও।'

দাদুকে অচিরা জানায় চিঠির কথা। এসেছে কলেজের অধ্য(পদের আমন্ত্রণ। জ্ঞানের সাধনা দাদুর নিজের জন্যে নয়, তা অন্যকে দানের জন্যে। অচিরা দাদুকে ওই পদ ফিরিয়ে নিতে বলে--কর্মের মধ্যে তাকে ঠেলে দেয় এবং সে তার দাদুর কর্মে সাহায্যকারী হয়ে থাকতে প্রতিশ্রুত হয়। সে প্রণাম জানায়, ডঃ সেনগুপ্তকে। সে জানায়--'আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে।' অচিরা বিবাহ নয় কাজেকেই প্রাধান্য দেয়--বিশিষ্ট প্রবন্ধকার সুনন্দা মৈত্র লিখেছেন ঃ 'আধুনিকোত্তর সভ্যতার বিষ বিবাহের যৌক্তি(কতা ম্লান হয়ে যায়। দাঙ্গা, দুর্ভি(, মহামারি, দেশভাগ, দু-দুটো বি্বযুদ্ধে আজকের পৃথিবী (তবি(ত। নারীকে নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করার ব্যাপারে বিবাহ অবশ্যই একটা বাধা। সিমন দ্য বোভোয়ার মতে বিবাহে স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা নষ্ট হয়ে যায়। বিবাহ নামক গন্ডীর মধ্যে নারীদের পু(ষদের মর্জিমাফিক চলতে হয়।' /জ্যোর্তিময় দাশ সম্পাদিত *লিটল ম্যাগাজিন দিগদর্শন*, ১৪০৭ (আধুনিকোত্তর সভ্যতার বিষবাষ্পে বিবাহের যৌক্তি(কতা ম্লান হয়ে যায়--সুনন্দা মৈত্র), অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯, কলকাতা, ২৩ পাতা/।

ঠিক একখানি স্পষ্ট না হলেও, বিবাহ না করার কথা অচিরা বলে না। কিন্তু তাকে আহত করে প্রবৃত্তির অন্ধকারে থাকা মানুষ। শেষপর্যন্ত দাদু, যে তার শি(ক ও কর্মগু(তার সঙ্গী হয়ে থাকতে চায়। কারণ কর্মের সাধনা হল সবথেকে বড়ো সাধনা, যার থেকে বেড়িয়ে আসা সম্ভবপর হয় না। ে ত্র গুপ্ত অবশ্য বলেছেন--'জীবনের প্রথম প্রেম প্রতারকের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ায় সে পরাজয়ের লজ্জায় গ্লানিতে চিত্তগহনে আশ্রয় খুঁজেছিল। অতি সতর্ক স্পর্শ কাতরতা একটা আত্মসংহরণ বৃত্তির দিয়েছিল। সে চাইছিল জগৎ থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতে, নিজের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে। বাসনাকে সে পাপ বলে অনুভব করতে চাইছিল, কারণ প্রবৃত্তির জাগরণ তাকে লজ্জাই দিয়েছিল, গৌরব নয়। ফলে কতক মর্ষকামিতা কিছুটা যৌনশীতলতা তার মনের গহনে বাসা বেঁধেছিল।'/ে ত্র গুপ্ত, রবীন্দ্রগল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থনিলয়, ২য় প্রকাশ ১৩৯৮, কলকাতা, ২৪৯ পাতা/।

অচিরার কাছে গু(ত্বপূর্ণ হয়ে যায় কাজ, আদর্শ দাদু'র সহকর্মিনী হওয়া। নাতনি নন্দিতা কৃপালনী যেমনটি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। নারীর চাহিদা মাতৃত্বে নয়, পত্নীত্বে নয়, কন্যাত্বে নয়--তার সার্থকতা কর্মের মধ্যে দিয়ে। কর্মের সার্থকতাই তার কাছে বড়, সঙ্গ ী বড় কথা নয়।

অচিরার মধ্যে এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সামাজিক মুক্ত(মন

'সামাজিক মুক্ত(মন' অধ্যায়ে আমরা রেখেছি, তিন ধরনের গল্প। এর মধ্যে আছে, বিধবা বিবাহ, অন্যধর্মে বিবাহ ও প্রতিবাদ এবং আপাতভাবে মনুষ্যেতর ও হিসাবে গু(ত্বপূর্ণ না হলেও নারীর জীবজগতের প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি ভালোবাসা ও র(ার ইচ্ছা। ঘটনাচক্রে(এই ভালোবাসার জন্যে নারীই এগিয়েছে। সাহস দেখিয়েছে পু(ষের নিষ্ঠুরতাকে কঠিন ও কঠোরভাবে প্রতিবাদ করতে। কখনো সে সফল, কখনো সে নয়। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়, এই প্রতিবাদী সত্তার স্ফুরণটুকুই যথেষ্ট। সামাজিক আন্দোলন কিংবা পরিবেশ র(া যাই হোক না কেন, নারীকেই সবসময় অগ্রণী ভূমিকা নিতে হয়।

এই তিন পর্যায়ের গল্পগুলি আলোচনা করা হল।

বিধবাবিবাহ

বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে যে ঢেউ উঠেছিল সমগ্র বাংলাদেশে, তার রেশ এসে লেগেছিল শিল্প ও সাহিত্যে এবং বলাবাহুল্য পারিবারিক জীবনেও।

উনিশ শতকে তিরিশের দশকে বিধবাবিবাহ নিরে 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় আলোচনা শু(হয়। এই দশকের শেষের দিকে *'India Law Commission'* এক সভায় বিধবাবিবাহকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবও করে। *[*রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকে নারীমুক্তি(আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৪০৬, কলকাতা, ৩১ পাতা*]*। রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো জানান--'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ও 'সংবাদ প্রভাকর'--এর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে বাদ প্রতিবাদ চরমে ওঠে। ১৮৪৫-এ *'The Bengal British Indian Society'* ধর্মসভাকে এ নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন করার অনুরোধ করলেন। কিন্তু ধর্মসভার কাছ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় ১৮৪৬-এ এ সোসাইটির তরফ থেকে (*'The Bengal British Indian Society'*) পুনরায় ধর্মসভাকে এ বিষয়ে সরকারের কাছে আবেদন করার অনুরোধ করা হয়। ধর্মসভা ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।' (ঐ)

অন্যদিকে বিধবাবিবাহ আইনের প্রবর্তক বিদ্যাসাগর বলেন যে,'স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুর্নবার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।'...*[বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র*, বিধবাবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তক), ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নির(রতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ৩৭ পাতা*]*।

বিদ্যাসাগর আরো লেখেন--'অনেকে এই আপত্তি করিয়াছেন, স্ত্রীর দ্বিতীয় বার বিবাহের মন্ত্র নাই। এই আপত্তি নিতান্ত অমূলক(কারণ বিবাহসম্পাদক মন্ত্রগণের মধ্যে কোনও মন্ত্রেই এরূপ কথা নাই যে, ঐ সমস্ত মন্ত্র দ্বিতীয়বার বিবাহকালে খাটিতে পারে না(সুতরাং, যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, দ্বিতীয়বারের বিবাহও সেই সমুদয় মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবেক। *[বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, ২য় খণ্ড, (বিধবাবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তক), পশ্চিমবঙ্গ নির(রতা দূরীকরণ সমিতি, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৭, কলকাতা, ১৪৫ পাতা*]*।

বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে লেখা হয় উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য--উমেশচন্দ্র মিত্র'র 'বিধবাবিবাহ' নাটক। সমর্থনে লেখা হয় আরো নাটক।

বিধবোদ্বাহ (১৮৫৬)	উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
বিধবামনোরঞ্জন (১৮৫৬)	রাধামাধব মিত্র।
বিধবাপরিণয়োৎসব (১৮৫৭)	বিহারীলাল নন্দী।
রামনবমী (১৮৫৭)	গুণভিরাম শর্মা।
বিধবাবিরহ (১৮৬০)	শিমুয়েল পীরবক্স।
চপলচিত্তচাপল্য (১৮৬১)	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
দলভঞ্জন (১৮৬১)	হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ম্যাও ধরবে কে (১৮৬২)	হরিশচন্দ্র মিত্র।
শুভস্য শীঘ্রং (১৮৬২)	হরিশচন্দ্র মিত্র।
বিধবাবিলাস (১৮৬৪)	যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বঙ্গকামিনী (১৮৬৮)	হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
এ্যাঙ্কসন্তাপিনী (১৮৭৬)	জনৈক ভদ্রমহিলা।
বঙ্গবিধবা (১৮৮২)	বিরাজমোহন চৌধুরী।
বিধবা (প্রকাশনকাল অজ্ঞাত)	নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য।

[রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকে নারীমুক্তি(আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৪০৬, কলকাতা, ৩১ পাতা]।

বিধবা বিবাহেরও বি(দ্ধে বহু নাটক লেখা হয়। সেগুলি হল ঃ

ত(বালা (১২৯৭)	অমৃতলাল বসু।
বাবু (১৩০০)	,,
বিধবার দাঁতে মিশি (১৮৭৪)	গোলাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। [তথ্যসূত্র - ঐ]

বিধবাবিবাহ নিয়ে যে উপন্যাস গুলি লেখা হয়েছিল সেগুলি হল ঃ

কৃষ(কান্তের উইল (১৮৭৯)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বিষবৃ((১৮৭৩)	,,
শৈশব সহচরী (১৮৭৮)	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মেজবউ (১৮৭৯)	শিবনাথ শাস্ত্রী।
যুগান্তর	,,
সংসার (১৮৮৬)	রমেশচন্দ্র দত্ত।
কঙ্কাবতী (১৮৯২)	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
বিরাজমোহন (১৮৭৮)	দেবীপ্রসন্ন চৌধুরী।
মনোরমার গৃহ (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)	চন্ডীচরণ সেন।
কমলকুমার (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)	,,
একটী চিত্র (১৮৮৬)	নগেন্দ্রনাথ বসু।
কুলকলঙ্কিনী (১৮৮৩)	দীনেশচরণ সেন।
অবলাবালা (১৮৮৭)	সত্যচরণ মিত্র। [তথ্যসূত্র - ঐ]

অন্যদিকে প(বিপ(লেখা একাধিক প্রবন্ধও রয়েছে। বিধবাবিবাহের প(যে প্রবন্ধগুলি লেখা হয় সেগুলি--

বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থা--আর্যদর্শন, কার্তিক চৈত্র (১২৮২) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চত্র(বর্তী।

হিন্দু বিধবাবিবাহ সমালোচনা (১৮৮২) শ্রী যাদবচন্দ্র রায়।

বিধবাবিবাহ আর্যদর্শন, চৈত্র (১৮৮৩), শ্রীশ।

বিধবাবিবাহ, ,, ,, (১৮৮৪) অজ্ঞাত।

নবজীবন ও বিধবাবিবাহ, নব্যভারত (১৮৮৫), শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

বিধবাবিবাহ সাধারণ্যে চলিত কেন হইতেছে না? 'পূর্ণিমা', বৈশাখ (১৮৯৬), অজ্ঞাত।

বিধবাবিবাহের বিপ(লেখা হয় ঃ

১. হিন্দুবিধবা, 'পরিচারিকা' ভাদ্র ১৮৭৯, অজ্ঞাত।

২. বৈধব্যব্রত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব গ্রন্থাবলী (একাদশ সংস্করণ) পৃ. ১৬০।

৩. হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, নবজীবন, জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৫, অ(য়চন্দ্র সরকার।

৪. বিধবাবিবাহ, ধর্মপ্রচারক, বৈশাখ-পূর্ণিমা ১৮৮৫, অজ্ঞাত।

৫. বিধবাবিবাহের অশুভফল, ধর্মপ্রচারক, বৈশাখ ১৮৮৬।

৬. বিধবাবিবাহ, নবজীবন, শ্রাবণ ১৮৮৬, অজ্ঞাত।

৭. 'হিন্দুবিধবা', ধর্মপ্রচারক, শ্রাবণ পূর্ণিমা ১৮৮৬, কস্যচিৎপরিব্রাজকস্য ইত্যাদি।

এতগুলো বছর ধরে বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে লেখা নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, প্রমাণ করে বিষয়টির গু(ত্ব কতখানি ছিল। স্বভাবতই সমাজের প্রভাব পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীর বিয়ে দিয়েছিলেন বিধবা প্রতিমাদেবীর সঙ্গে। অবশ্য এরও একটি পূর্ব ঘটনা আছে 'কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর অনেকদিন থেকেই একান্ত ইচ্ছা ছিল, ভারি সুন্দরী এই মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে আনেন। রবীন্দ্রনাথেরও অমত ছিল না। কিন্তু তখন আর ঘটে উঠেনি। অভিভাবকরা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিছুদিন আগেই মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু (২৯.১১.১৯০২) হয়েছে। তাছাড়া রথীন্দ্রনাথও তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাই হয়ত রবীন্দ্রনাথ একটু দেরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ের অভিভাবকরা অপে(া করতে রাজি হননি। মাত্র বছর দশেক বয়সেই প্রতিমার বিয়ে /ফাল্গুন, ১৩১০/ হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নীলানাথের সঙ্গে। আর বিয়ের মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যেই গঙ্গার ডুবে মারা যান নীলানাথ। অকালে বিধবা হন প্রতিমা।

মৃণালিনী দেবীর ইচ্ছাই কিন্তু পূর্ণ হয় শেষ পর্যন্ত। রথীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে শি(া শেষ করে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথেরই আগ্রহে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর বিয়ের সম্পন্ন হয় ১৪ই মাঘ, ১৩১৬, ইংরেজি ২৭.১.১৯১০ তারিখে। প্রতিমাদেবীর বয়স তখন ১৬ আর রথীন্দ্রনাথের বয়স ২১। ঠাকুর বাড়িতে এই প্রথম বিধবাবিবাহ।' /প্রতিমা দেবী, *স্মৃতিচিত্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৪০৬, কলকাতা, ৫ পাতা/।

রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্প পূর্ণতা পেয়েছিল বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ তার দুটি গল্পেই প্রকারান্তরে বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে আলোকবর্তিকার আর একস্তরে পৌঁছে দিয়েছেন ভাবনাকে। বিধবাবিবাহ নিয়ে তাঁর গল্প দুটি হল 'ত্যাগ' ও 'প্রতিবেশিনী'। এ দুটি গল্পে নারীদের মনে কোন সংস্কার নেই তেমন। কিন্তু সমাজকে তারা উপে(া করতেও পারে না। অবশেষে সমাজ তাদের পূর্ণ সম্মতি দেয়।

ত্যাগ (১২৯৯)

১২৯৯ সালে লেখা এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, নারী বিধবা হয়েও ভালোবাসে হেমন্ত নামে একটি যুবককে। এবং তাদের এই প্রেম চোখে পড়ে প্যারিশঙ্কর ঘোষালের। তিনি এদের বিয়ে সংঘটিত করান। তাঁর উদ্দেশ্য বিধবাবিবাহ ঘটানো ছিল না, ছিল হেমন্ত'র পরিবারের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ। কারণ প্যারিশঙ্করের জামাই নবকান্ত বিদেশে গেলে তাকে আর জাতে ওঠানো হয় না। এ ব্যাপারে বাধা দেন হেমন্তেরই পিতা হরিহর। শুধু তাই নয়, তিনি আবার যখন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিয়ে দেন এ খবর দিয়ে বিয়ে ভেঙে দেন। প্যারিশঙ্কর তাই হেমন্তের সঙ্গে বিধবা কুসুমের সঙ্গে বিয়ে দেন এবং তার ছোটো বোনের বিয়ের সময় সেকথাটা প্রকাশ করে দিলেন। প্যারিশঙ্করের এই রেষারেষি খেলার বলি হল কুসুম--যে হয়ে গেল 'ক্লেদজ'। কিন্তু সমাজে তখন বিধবাবিবাহের প(স্রোত

প্রবাহমান, আর তাই কুসুমের ভালোবাসা সমাজস্বীকৃত হল।

পরে হেমন্ত প্যারিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'কুসুম এই বিবাহে কোনো আপত্তি করে নাই?' উত্তরে প্যারিশঙ্কর জানান, 'আপত্তি ছিল কিনা বোঝা ভারি শক্ত। জান তো বাপু, মেয়ে মানুষের মন--যখন 'না' বলে তখন 'হাঁ' বুঝিতে হয়। প্রথমে তো দিনকতক নূতন বাড়িতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মতো হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম, কোথা হইতে সন্ধান পাইয়াছ প্রায়ই বই হাতে করিয়া কলেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত--এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কলেজের রাস্তা খুঁজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পাতাল এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড়ো দুঃখ হইল, দেখিলাম তোমার পড়ার বড়োই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সংকটাপন্ন।'

প্যারিশঙ্কর বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, হেমন্তের দুর্বলতাও কিছু কম ছিল না। কেবল কুসুম বিধবা বলেই কি এত অসুবিধা হল?

হেমন্ত এই গল্পে বাস্তবের সামনে হতচকিত, বিস্মিত। হয়তো সে কুসুমের উপর বিরক্ত। কারণ কুসুম তাকে জেনে বিয়ে করেছে। অবশেষে প্যারিশঙ্কর জানিয়ে দেন কুসুমের আপত্তির কথা। যখন কুসুম শুনেছিল বিয়ের কথা, সে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠেছিল এবং ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্যারিশঙ্কর জানিয়েছেন--'এমন করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুসুমকে ডাকিয়া, তোমার কথা পড়িয়া, ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না। মিলনের আর কোনো উপায় নাই।' কুসুম বলেছিল--কেমন করে তা ঘটবে? প্যারিশঙ্কর জানান--'তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব।'

বিবাহের কিছু আগে কুসুম বেঁকে বসেছিল। তখন প্যারিশঙ্কর তাকে বুঝিয়েছিলেন, 'সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কী বলিয়া ফিরাইব।' কুসুম বলে, 'তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে--আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও।' প্যারিশঙ্কর তাকে বলেন, 'তাহা হইলে ছেলেটির দশা কী হইবে। তাহার বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে। আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব। আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বুড়োবয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।'

এভাবে কুসুম বাধ্য হয় বিয়ে করতে। হেমন্ত জানায় 'এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কী হইবে।' অর্থাৎ হেমন্ত পরিত্যাগের কথা ভাবে এবং এর আশ্রয়ের কথাও ভাবে। এবং হেমন্ত জানতে চায়, কুসুমের এই উপকারকর্তা তাকে আশ্রয় দেবে কিনা! তার জিজ্ঞাসা, 'আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?'

প্যারিশঙ্কর উত্তর দেন, 'পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম নহে।'

হেমন্ত অবশেষে হরিহরকে উপেক্ষা করে জানায়--'আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।' হেমন্ত ১৮৫৬ সাল পার করে আসা এক যুবক, যে সমাজ এবং কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে অবশেষে কর্তব্য ও প্রেমকেই গুরুত্ব দেয়। তাছাড়া ১২৯৯ (ইং ১৯০৬) সালে বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ। এ গল্পে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের অধিকারী পিতা তাকে তাড়িয়ে দেন ঠিকই, কিন্তু বিধবাবিবাহকে মেনে নেওয়া হয়।

প্রতিবেশিনী

এ গল্পে কোন যন্ত্রণাই নেই। বরং বিধবা মেয়েটির প্রেমে পড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত আছে। এ গল্পটিও 'আমি'র বয়ানে লেখা। প্রথমেই 'আমি' জানিয়েছে--'আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা'--সে কেবল দেবপূজার জন্যই উৎসর্গীকৃত এবং তাকে এই আমি--মনে মনে 'পূজা' করে। গল্পে নায়ক তার এই ভাবকে গোপন রাখে--'পরের কাছে তো নয়ই, নিজের কাছেও নয়।'

এমনকি অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু নবীনমাধবকেও সে জানায় না একথা। কারণ হিসেবে নায়কের জ্ঞাপন, 'আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্মল করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাতে আমি কিছু গর্ব অনুভব করিতাম।'

কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ পায়--'তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতায় ভাব প্রকাশ করিব।' ঠিক এসময়ই নবীনমাধবেরও কবিতা লেখার

ঝোঁক এল। 'কবিতা যেন বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় প(ে র স্ত্রীর মতো তাহাকে পাইয়া বসিল।' নবীন প্রেমের কবিতা লেখে আরো জানায়--যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। এবং নায়ক নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি (দ্ধ আবেগ প্রয়োগ করল। নবীন বিস্মিত হয়ে জানায় যে, ঠিক এসব কথা সে বলতে চায়, কিন্তু সে বলতে পারে না। অথচ নায়ক কি করে একথা লেখে? নায়ক জানায়--মুখরা কল্পনা এভাবে জাগিয়ে দেয়। নায়কের ভালোবাসায় একটা সংকোচ ছিল, নিজের জবানিতে তা লেখা গেল না, গেল নবীনের জবানিতে। ত্র(মশ নবীনের লেখাগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

হঠাৎ একদিন নায়ক আবিষ্কার করল, 'আসন্ন ঝঞ্ঝার মেঘবিচ্ছুরিত (দ্রদীপ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন তাহার শূন্যনিবিষ্ট--ঘনকৃষ(দৃষ্টির মধ্যে কী সুদূর প্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।' সেই বেদনা দেখার পর কোনো প্রকার কাজ করবার ইচ্ছে দেখা গেল না নায়কের। সে কাজ কি? বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা, বক্তৃ(তা ও লেখা শুধু নয়, অর্থ সাহায্যও করা।

'বামাবোধিনী' পত্রিকায় লেখা হয়--'বঙ্গদেশের মধ্যে বিধবা রমণীর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করবার রীতি বহু দিবসাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। এই ঘৃণিত নিয়ম কেবল ইতর লোকের গৃহেই বিদ্যমান আছে এমনও নহে। অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও ইহার বিদ্যমানতা শ্রুতিগোচর হয়। বিধবা হইলেই বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, এটী এদেশের অনেকের সংস্কার হইয়া গিয়াছে।' [*বামাবোধিনী পত্রিকা*, সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, নবম বর্ষ ৯২ সংখ্যা, চৈত্র১২৭৭ সাল, ৩৬৬ পাতা]।

সেজন্য এর বি(দ্ধে আন্দোলনও হচ্ছিল।

গল্পের নায়ক বিধবাবিবাহের প(ে হলেও নবীন তর্ক করে 'চিরবৈধব্যের পবিত্রশান্তি'র কথা বলে। ঘটনাচত্রে(বিধবারা অনেকেই 'ভুল পথে'ও পা বাড়াত--যেমন রবীন্দ্রনাথেরই 'বিচারক' গল্পে পেয়েছি।

'১৮৭২ সালে মতামত জানাতে গিয়ে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার উপ-জেলাশাসক বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মনে করেছিলেন পতিতাদের সংখ্যাগু(অংশ আসে হিন্দু সমাজ থেকে। সম্ভাব্য কারা কারা এই অংশভুক্ত(তার একটা তালিকাও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।

(ক) অল্পবয়সী বিধবা নারী।

(খ) অবৈধ সন্তান থাকার কারণে সমাজ বিতাড়িত বিধবা নারী।

(গ) অল্পবয়সী সুন্দরী রমণী যাদের ঘরে নিষ্ঠুর অথবা কুৎসিত স্বামী বর্তমান।

(ঘ) কুলীন ঘরের অবিবাহিত নারী অথবা হয়তো পঞ্চবিংশতি স্ত্রী।

তালিকার শু(তেই উল্লেখিত হয়েছে বিধবাদের কথা। তালিকাটি কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হলেও বিধবাদের ে(ত্রে সত্য কারণ কলকাতায় প্রথম *generation* পতিতাদের সংখ্যাগু(অংশ ছিল উচ্চজাতের বিধবা বা স্বামী--অবহেলিত স্ত্রী যারা কোনো একটি পদস্খলনের কারণে সমাজ থেকে বহিস্কৃত হয়ে স্থান নিত--কলকাতায় নিষিদ্ধ পল্লীতে।' [বিদিশা চত্র(বর্তী, *সরকারী নথিতে উনিশ শতকে বাংলার নারী*, প্রভা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯, কলকাতা, ২৫ পাতা]। কিন্তু নায়ক দমল না। তাকে বোঝাল। এবং নবীনমাধব মেনেও নিল সহজেই। এবং সপ্তাহখানেক বাদে এসে জানাল, 'তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।'

নবীনমাধবের বক্তৃ(ব্য, 'কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভালোবাসিত কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিক পত্রে নবীনের, ওরফে আমার, কবিতা বাহির হইত সেই পত্রগুলি যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিত। কবিতাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সা(াৎকারে চিত্ত আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।'

শুধু তাই নয়, বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজ পাঠিয়ে দিত নবীন। এবং নানা ছুতোয় ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছিল। 'যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহার নিকটবর্তী আত্মীয়ের সঙ্গ মধুর বোধ হয়।' তারপর ভাইয়ের কঠিন পীড়া উপল(সম্পর্কের ঘনিষ্টতা। পরে বিধবার সঙ্গে সা(াৎ করে বিয়ের প্রস্তাবও সে করে। নায়কের বয়ান,'প্রথম কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তখন আমার মুখের সমস্ত যুক্তি(গুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের চোখের দুই চার ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে।'

এ গল্পে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে মেয়েটির সম্মতিতেই জোর দেওয়া হয়েছে। জানা যায়--বিধবার পিসে কিছু টাকা চায়। এছাড়া নবীনের বাবা পাঁচ ছয় মাস মাসোহারা বন্ধ করে দেবেন। সেই টাকা পাবে কোথায়--নায়ক তাই চেক লিখে দিল।

অবশেষে নায়ক জানতে চায় মেয়েটির নাম কি। প্রতিজ্ঞা করে--'আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।' নবীন মেয়েটি তাদেরই প্রতিবেশিনী--উনিশ নম্বরে থাকে। নায়ক অসহায়ের মত জিজ্ঞাসা করেন--'বিধবাবিবাহে তাঁহার অমত নাই?' নবীন জানায়--'সম্প্রতি তো নাই।'

নায়ক জানাতে চায়,--'কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মুগ্ধ'।

নবীন বলে--'কেন, আমার সেই কবিতাগুলি তো মন্দ হয় নাই।'

নায়ক নিজেকে ধিক্কার দেয়, কারণ এই প্রেম তারই কারণে মুকুলিত হয়েছে অথচ সে নিজেই রয়ে গেছে বঞ্চিত। এ গল্পে মজার ছলে বিধবা রমণীর প্রতি প্রেম ও বিবাহকে স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি গু(ত্ব দিয়েছেন নারীকে তার ব্যক্তি(ত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধকে। বিধবারমণীর ইচ্ছেটাকেই এ গল্পে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে--সমাজকে নয়। এবং যুগান্তকারী এ গল্পটি আলোকমালার অন্য এক তারা--যাকে বলা যায় অগ্রগতির নতুন বাণীর সূচনা।

মুসলমানীর গল্প (২৪-২৫ জুন, ১৯৪১)

'মুসলমানীর গল্প' খসড়া আকারে লেখা। কিন্তু যেহেতু এটা গল্পগুচ্ছ অর্ন্তভুক্ত(করা হয়েছে, সেহেতু আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করলাম। এ গল্পের বিষয় একটি হিন্দু মেয়ে তার বিয়ের পরে (শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে ডাকাতের হাতে পড়ে, অবশেষে বর পালালে মুসলমান হাবিব খাঁ তাকে আশ্রয় দেয় এবং তার বাড়িতে শেষপর্যন্ত পুত্রবধূ হিসাবে তার স্থান হয়। কারণ মেয়েটির হিন্দু কাকা তাকে ফিরিয়ে নেয় না। প্রকারান্তরে সে মুসলমান বাড়িতে হিন্দুধর্ম পালন করে। অন্যদিকে কাকার মেয়ের বিয়ের সময়সে নিজেই ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করে মেয়েটিকে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবারে পিরালি ব্রাহ্মণ বলে সমস্যা ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের কনে হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি কাদম্বরী দেবীকে। কিন্তু একথা জানার পর মহর্ষি লেখেন ঃ 'জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এই-ই ভাগ্য।' আরো লিখলেন, 'একে ত' পিরালি বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহে যোগ দেয়, না তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য পিরালিরা আমাদিগকে ভয় করে।' /দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান*, সুবর্ণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৬, কলকাতা, ৩৯ পাতা/। ঠাকুরবাড়ি 'পিরালি' ও ব্রাহ্ম হওয়ায় সমস্যা হয়েছিল খুবই।

ছোটগল্পকার ও রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন ঃ 'রঘুপতি আচার্যের অধস্তন চতুর্থ পু(ষ জয়কৃষ(ব্রহ্মচারী বোধহয় 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই জয়কৃষে(র দুই পুত্র--নাগর ও দ(িণানাথ। দ(িণানাথের চারি পুত্র--কামদেব জয়দেব রতিদেব ও শুকদেব। মুসলমান সম্পর্কে কামদেবাদি প্রথম যবনদুষ্ট হইয়া 'রায়চৌধুরী' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।' /প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*,১ম খণ্ড, (বংশ পরিচয়) বি(শ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৪০, কলকাতা, ৩ পাতা/।

শুকদেবের কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয় জগন্নাথ কুশারীর। জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুরগোষ্ঠীর আদিপু(ষ। 'পিরালি' ব্রাহ্মণ হওয়ার অনেক গল্পই প্রচলিত আছে। 'খান জাহান আলি নামে এক মুসলমান সামন্ত যশোহর জেলায় নিজের প্রতিপত্তি স্থাপন করেন এবং নবাব নামে পরিচিত হন। তাঁর অধীনস্থ দেশে এক হিন্দু পরিবারের চারটি ভাই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম দুই ভ্রাতা কামদেব ও জয়দেব খান জাহান আলির প্রধান কর্মচারী ছিলেন।

একদিন রোজার সময় বিকালে খান জাহান আলিকে এক ভদ্রলোক কতকগুলি লেবু এনে উপহার দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি তিনি আঘ্রান করলেন। সেখানে কামদেব ও জয়দেব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উপহাস করে বললেন যে নবাব সাহেব ভাল কাজ করলেন না, লেবু আঘ্রান ক'রে রোজার নিয়ম ভঙ্গ করলেন। নবাব কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা ব্যাখ্যা করে বললেন, হিন্দুদের মতে ঘ্রাণে যে অর্ধভোজন হয়ে যায়। নবাব এই পরিহাসকে পরিহাস বলে গ্রহণ করেন নি।'

তিনি পরে একদিন এক উৎসবে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি(কে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট কর্মচারীদের অন্যতম হিসাবে এই দুই ভ্রাতাও নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই উৎসবে রীতিমত ভোজনের আয়োজন হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ভোজ্যের মধ্যে অনেক হিন্দুর নিষিদ্ধ মুসলমানী খানা ছিল। গোমাংস তাদের অন্যতম। তাতে আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ স্বয়ং নিমন্ত্রণকর্তা মুসলমান। ভোজনের সভায় ভোজ্যদ্রব্যের গন্ধ নাকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খান জাহান আলি বলে বসলেন যে কামদেব ও জয়দেবের নিষিদ্ধ ভোজ্য খাওয়া হয়ে গেছে এবং তাঁদের ধর্মনাশ হয়ে গেছে। সেই অজুহাতে তিনি জবরদস্তি দুই ভ্রাতাকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান ধর্মে দী(িত করলেন।

এখন চার ভাই এক সঙ্গে বাস করতেন। তাঁদের দুজন হঠাৎ আকস্মিকভাবে নবাবের খেয়ালে ধর্মান্তরিত হলেন। কিন্তু তাই বলে রাতারাতি ও তাঁরা তাঁদের পরিবারকে অন্য দুই ভ্রাতার পরিবার হতে পৃথক করতে পারেন না। সুতরাং ধর্মান্তরিত দুই ভ্রাতার পরিবার এবং যারা হিন্দু রয়ে গেল তাদের পরিবার বাধ্য হয়ে কিছুকাল একত্র বাস করেছিল। ধর্মান্তরিত ভাইয়েরাও এই বাড়িতে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং তারা চলে গেলে পরে যে দুইভাই, ধর্মান্তরিত হলেন না তাঁদের পরিবার, ধর্মান্তরিত হিন্দুর সঙ্গে কিছুকাল একত্র বাস করার দোষে দুষ্ট হলেন। এই হল পীরালি দোষের মূল কারণ।' [হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঠাকুরবাড়ীর কথা*, (পূর্বপু(ষ), সাহিত্য সাংসদ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩, কলকাতা, ১৫ পাতা]।

আর এখানে 'মুসলমানীর গল্পে' সরাসরি এমন মুসলমান হিন্দুর মেয়েকে আশ্রয় দেয়--তখন তাকে আর সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয় না। এ গল্পে তাই ঘটেছে। এ গল্পে কমলা তার কাকার কাছে আশ্রয় পায় না, মুসলমান ধর্মে মানুষের কাছে আশ্রয় নিয়েছে বলে। কমলা অবশেষে মুসলমান ধর্মে জন্মানো একটি ছেলেকে বিয়ে করে এবং নাম পরিবর্তন করে। কিন্তু এই ধর্মবদলটাই বড় কথা নয়, কমলা জানায়--'তার ধর্মের নাম ভালোবাসা, সে যাকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার ধর্মই তার কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যে প্রেমের মধ্যে সমস্ত জগতে মানুষ আপনার সত্য স্থানটিকে পায়, সমস্ত মানুষের সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সেই পরম প্রেমটিকে না পেলে মানুষ মানুষকে বেদনা ও আঘাত থেকে র(া করতে পারে না।' [*রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৮ম খণ্ড, (শান্তিনিকেতন--মা মা হিংসী), বি(ভারতী, রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপল(২য় সং ১৪০২, কলকাতা, ৬৭৬ পাতা]।

অরাজকতার যুগে রাষ্ট্রশাসন, অত্যাচার অভিঘাতে যখন দিনও রাত দোলায়িত হত, তখন এ গল্প লেখা। গৃহস্থ মানুষেরা ভাবত, কখন কি ঘটে। 'বাড়িতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্য-বিধাতার অভিসম্পাত।' 'কমলা ছিল সুন্দরী' কাকা বংশীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। ওর কাকী প্রায় বলত-- 'দেখ্ তো ভাই, মা বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে।' এবার ওর বিয়ের সম্বন্ধ এল। 'ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে।' তার 'এক স্ত্রী আছে, আর একটি নবীন বয়সের সন্ধানে সে ফিরছে। কমলার রূপের কথা তার কানে উঠল।' শেঠবংশ খুব ধনী, খুব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হল তাদের পণ।

কাকা বলল, বাবাজি, 'এত ধুমধামকরা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।'

বুক ফুলিয়ে বললে--'কোনো ভয় নেই।'

'কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে, তালতড়ির মাঠ। মধুমোল্লার ছিল ডাকাতের সর্দার। মধুমোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে পড়লে পরিত্রাণ নেই। কমলা ভয়ে চর্তুদোলা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল এমন এই সময় এসে পড়লেন বৃদ্ধ হবির খাঁ--তাকে সবাই পয়গম্বরের মতো ভক্তি(করে, তিনি বললেন--'তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চলো আমার ঘরে।'

'হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই কিছু মানুষ বরাবরই থাকেন যাঁরা আপন চেতনাকে মুক্ত(করতে পেরেছিলেন অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞার মানসিকতা থেকে। যাদের উত্তরসূরিরা আজও আছেন।' / আবদুর রউফ,*গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা*, (শ্যামাপ্রসাদ ও সাম্প্রদায়িকতা), নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ ১৪০৮, কলকাতা, ৬১ পাতা]।

কমলা স্বভাবতই সংকুচিত হয়ে পড়ল। হবিব বলল, 'বুঝেছি তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো--যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দু বাড়ির মেয়ের

মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চলো, তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব।'

কমলাকে তিনি আশ্বাস দিলেন, 'দেখো আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে ভয় কোরো না।'

কমলা জানায় তার কাকাকে খবর দিতে। কিন্তু কাকা কাঁদলেও কাকী বলে--'সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার, তোর লজ্জা নেই!' কাকা জানাল--'আমাদের যে হিন্দু ঘর, এখানে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।' বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ও দেখি--মুসলমান হয়ে যাবার জন্যে 'মতিবিবি' আর হিন্দু সমাজে গ্রহণীয় হয় না। এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে জাহাঙ্গীরের সময়কালে কথা বলেছেন এবং কপালকুণ্ডলা যদিও ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কিন্তু এটা সত্যি মুসলমান ধর্ম থেকে আর হিন্দুধর্মে ফেরা যায় না। এমনকি হিন্দু সমাজে খ্রিস্টান হয়ে গেলে গোবরজলে প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবা হত।

কমলা ফিরে গেল বৃদ্ধ হবির ঘরে। এই বংশে এক রাজপুতানী ছিল--সে শিবপূজা করত, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণেও যেত। শোনা যায় হবির খাঁ তারই পুত্র। কমলা তাদের কাছে যা পেল নিজের বাড়িতেও কোনোদিন পেত না। 'রাজপুতানী মহলে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেলে। এখানে তার আদরের অন্ত ছিল না।' চারিদিকে তার দাসদাসী, সবই হিন্দু ঘরের ছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,'অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পৌঁছল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে আনাগোনা শু(করল কমলার মহলে, তার সঙ্গে সে মনে-মনে বাঁধা পড়ে গেল।' একদিন হবিব খাঁকে সে বলল, 'আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজও আমি ভুলতে পারি নে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম, বাপজান, তোমার ঘরে। জানতে পারলাম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা--তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাঁকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি--আমার ধর্মাধর্ম ওঁরই সঙ্গে পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না--আমার না হয় দুই ধর্মই থাকল।'

কমলা'র নাম হল মেহেরজান। 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে পদ্মাবতী ছিল হিন্দু পরিবারের সন্তান। বিয়ের পর বাবা-মা'র সঙ্গে শ্রীধাম যাবার পথে, তাঁদের ধর্মান্তরীকরণ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবশ্য পার্থক্য আছে--বঙ্কিমচন্দ্র জোর করে ধর্মান্তরীকরণ করলেন, আর রবীন্দ্রনাথ ধর্মপরিবর্তনের কারণ দেখালেন।

'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--'তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণিয়-দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।' /*রবীন্দ্ররচনাবলী*, (কালান্তর--লোকহিত), দ্বাদশ খণ্ড, বি(ভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপল(২য় সং ১৪০২, কলকাতা, ৫৪৯ পাতা/।

যে ধর্ম তাকে আশ্রয় দিয়েছে--কমলা সেই মুসলমানী। আর তাই তার কাকার মেয়ে সরলার বিয়ের সময় ঘটে একই ঘটনা। কারণ ডাকাতদের আগের শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। পেছনে শোনা গেল হুঙ্কার। ডাকাতরা ভাবল, হবির খাঁ'র চেলারা এসে সব নষ্ট করে দিল। কন্যাপ(রা কন্যাকে ফেলে পলিয়ে গেল, হবির খাঁ'র বর্শা নিয়ে এসে দাঁড়াল মেহেরজান। সরলাকে বলল, 'তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন। যিনি কারও জাত বিচার করেন না।'

কাকাকে সে প্রণাম জানায়। এও জানায়, সে কাকাকে স্পর্শ করবে না। কেবল বলে, 'কাকিকে বোলো অনেক দিন তাঁর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ হয়েছি, সে ঋণ যে আমি এমন করে আজ শুধতে পারব তা ভাবিনি। ওর জন্য একটি রাঙা চেলি এনেছি। সে এই নাও, আর একটি কিংখাবের আসন। আমার বোন যদি কখনো দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে, তাকে

র(া করবার জন্যে।'

গল্পটি খসড়া না হলে কমলা বা মেহেরজানের সংস্কার শূন্য, প্রতিবাদী, অলোকসত্তার স্ফূরণ--'আরো দেখা যেত। কিন্তু এরই খসড়াতেই যে নারীকে আমরা পাই--তার ব্যক্তি(ত্ব, আলোকের অন্য ধারা বহন করে আনে।'

'আলোকপ্রাপ্তা নারী' হিসাবে আরো যে দুটি গল্পকে রেখেছি, তার প্রথমটি হল 'অনধিকার প্রবেশ' (১৩০১)(দ্বিতীয়টি 'বলাই' (১৩৩৫)। এ গল্প দুটিতে কিন্তু একজন নারী প্রতিবাদী হয়েছে, বা আলোকপ্রাপ্তা হয়েছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চিত্র ফুটে ওঠেনি সমগ্রতায়, কিন্তু একটি ঘটনায় তার বৈশিষ্ট্যের স্বরূপটি চিহ্নি(ত হয়েছে। যেমন 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে জয়কালী স্বতন্ত্র, প্রতিবাদী ছিল কিন্তু সে প্রতিবাদে সামাজিক আলোক চিহ্নি(ত হয়নি, শূকরছানাকে র(ার মাধ্যমে জয়কালীর প্রতিবাদ, চিরকালীন মানব- শক্তি(র রূপের জয়গান গাওয়া হয়েছে। অসহায় প্রাণী হত্যার বি(দ্ধে প্রতিবাদ করেছে জয়কালী আর 'বলাই' গল্পে রয়েছে নারীর বৃ(োচ্ছেদের বি(দ্ধে প্রতিবাদ।

প্রথমে আলোচিত হবে 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি।

অনধিকার প্রবেশ (১৩০১)

'অনাধিকার প্রবেশ' গল্পে মাধবচন্দ্র তর্ক বাচস্পতির বিধবা পত্নী, জয়কালী দেবী রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। জয়কালী বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু অনেক সময় দু'এক কথায় এমনকি নীরবেও তাঁর স্বামীর মুখ বেগে বন্ধ করে দিতেন। জয়কালী তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তি র(া করেছিলেন, তাঁর প্রাপ্য থেকে কেউ তাকে এককড়ি বঞ্চিত করতে পারেননি। জয়কালীর কোন যথার্থ বন্ধু ছিল না, স্ত্রীলোকেরা তাকে ভয় পেত, জয়কালী ছিল কঠিন স্বভাবের, গ্রামের সকল লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং অন্তরে তিনি ছিলেন একাকী। বিধবা নিঃসন্তানও ছিলেন, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল--আঠার বছর বয়সের। বিবাহ বিষয়ে তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু জয়কালী তাঁকে বিবাহ দিতে চাননি, পুলিন উপার্জন(ম ছিল না বলে। জয়কালীর একমাত্র আদরের ধন ছিল তাঁর রাধানাথ জীউ। অনাচারী ব্যক্তি(পরম আত্মীয় হলেও, তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিতেন না। যবনকরপক্ক--কুক্কটমাংস--লোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়-সন্দর্শন উপল(্যে গ্রামে উপস্থিত হলে মন্দির অঙ্গনে প্রবেশ করবার অধিকার পায়নি। ছোট ভাইপো নলিন, মাধবীমঞ্জরীর ফুল পাড়তে উঠলে, জয়কালী তাকে সারাদিন দরজা বন্ধ করে রেখে দেয়। জয়কালীর এ হেন প্রতিবাদ অবাকই হবার মত। দাসী মো(দা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে (মা করতে অনুনয় করলেন, কিন্তু জয়কালী তার ইচ্ছা থেকে নড়ে নি। অথচ এই জয়কালী বলির শূকরকে র(া করে উন্মত্ত ডোমের দলের হাত থেকে। এই স্থানে জয়কালী অন্যরকম। ডোমের দলও ভাবেনি, জয়কালী কিভাবে র(া, করবে শুকরকে। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষি(প্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দে সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দী তীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে--বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।'

এই ব্যাপারটি 'বীভৎস' এভাবেই দেখানোর চেষ্টা আছে অর্থাৎ উন্নত মনের একাকী, নীতিবাদী, স্পষ্টবক্তা, নিষ্ঠুর জয়কালী হয়তো শূকরটিকে বার করে দেবেন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। পূজারী ব্রাহ্মণও সেকথা ভেবেছিল--তাই লাঠি হাতে তাড়া করতে এল। কিন্তু 'জয়কালী তৎ(ণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার (দ্ধ করিয়া দিলেন।'

জয়কালীর মন্দিরের কাছে ডোমের দল চিৎকার শু(করল। এবং তাদের বলির জন্যে সেই চিৎকারের সুর তীব্র হল। কিন্তু জয়কালী (দ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র-করিসনে!' ডোমের দল ফিরে গেল। তারা ভাবতেও পারেনি, জয়কালী ঠাকুরাণী তাঁদের রাধানাথ জীউর মন্দিরে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দেবেন।

কিন্তু জয়কালী পশুর প্রাণর(া করেন। শূকরছানা প্রাণের প্রতীক। জয়কালী আত্মীয় সম্পর্ককে। সামাজিক ইচ্ছাকে, বা ছোটছেলের দুষ্টুমিকে প্রশ্রয় দেন না, কিন্তু নিরীহ অসহায় পশুর প্রাণ র(া করেন। শূকরটি তার কাছে, নেহাতই শূকর ছানা নয় বা কোন অশুচি প্রাণী নয়, শূকর তার কাছে অসহায় প্রাণের প্রতীক, উন্মত্ত হিংসাশ্রয়ীর হাত থেকে থাকে র(া করা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে জয়কালীর

মনে হয়।

জয়কালী, প্রতিবাদী। অবশ্য এ প্রতিবাদ তার মত করেই দীপ্ত, তীব্র এবং ব্যক্ত(আকারে ছড়িয়ে পড়ে। লেখক মন্তব্য করেছেন--'এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু (দ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি (দ্র দেবতাটি নিরতিশয় সং(দ্ধ হইলেন।

সম্ভবত (দ্রদেবতাকে জয়কালী অস্বীকার করতেই পারবেন। কারণ জয়কালীর কাছে যা তা সত্যই, অত্যন্ত সহজ, এবং জয়কালী তাকে অস্বীকার করেন না। জয়কালী ব্যক্তি(ত্বসম্পন্না, স্বাতন্ত্র্যময়ী হতে পারেন, কিন্তু জয়কালী আপাত ছুৎমার্গিতায় বি(াসী নয়। শূকর ছানার প্রাণ র(ার মাধ্যমে প্রতিবাদী জয়কালীই আমাদের মানসপটে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। জয়কালী এতদিন যেসব কাজ করেছে, তার কোনটাতেই অধিকারের সমাজগত গ্রাম্য সীমা লঙঘন করার বিষয় নেই। সমাজপ্রভুত্ব যেখানে আসীন, উচ্চবর্ণ নীচবর্ণে রয়েছে ভেদাভেদ, সেখানে জয়কালী বিপ-বসাধনই করে। এমনকি জাতিবিভাজনের কারণে দেবদত্ত বলির পশুও যে সমাজে পৃথক, সে সমাজ থেকে সবসময় দূরে থাকবে জয়কালী, এমনটি আশা করা যায়। বা আশা করে তার সমাজের লোকেরা 'কঠিন', 'নিষ্ঠুর' 'ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যময়ী' জয়কালীর কাছে। কিন্তু জয়কালী ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যময়ী প্রতিবাদী কিন্তু মানবধর্মকে তিনি বর্জন করেননি। আর ঐ সমাজে, ঐ ১৩০১ এর সমসাময়িক সমাজে বিষয়টি কিন্তু কঠিনই ছিল।

বলাই (১৩৩৫)

সম্পূর্ণ অন্য প্রতিবাদের গল্প 'বলাই'। শান্তিনিকেতনে যখন রবীন্দ্রনাথ বৃ(রোপণ করাচ্ছেন, সারা পৃথিবী জুড়ে একদিকে শু(হতে যাচ্ছে যুদ্ধ যুদ্ধ আবহাওয়া, অন্যদিকে তেমনি পরিবেশ র(া নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শু(হয়েছে, বৃ(রোপণকে উৎসবে পরিণত করা হচ্ছে, ঠিক তখনই লেখা হচ্ছে 'বলাই' গল্পটি। 'বলাই' গল্প একটি বালকের বৃ(কে ভালবাসার ছবি, কিন্তু পু(ষ সেই ভালবাসাকে আঘাত করলেও নারী প্রতিবাদী হয়ে সেই ভালবাসাকে র(া করার জন্যে সচেষ্ট হয়, ব্যর্থ হয় কিন্তু প্রতিবাদ করে।

কাকার কাছে মানুষ হওয়া বলাই ছোট থেকেই গাছপালা, প্রকৃতিকে ভালবাসত। সেই ভালবাসা হৃদয়ের সঙ্গে আত্মস্থ করার--'ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেল বেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়(সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তে(র মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত(স্মৃতিতে(ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে--ভরে ওঠে, তাতে একটা যেন ঘন রঙ লাগে।' কেউ ফুল তুললে বলাইয়ের গায়ে বাজত, একবার একটা শিমূল গাছকে অঙ্কুরিত হতে দেখল বলাই। বলাই ভেবেছিল কাকাকে সে চমৎকৃত করে দেবে। বলাই সেই গাছকে প্রতিদিন জল দিত বাড়ার জন্যে। গাছটি 'যখন উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।'

বলাই-এর কাকা সেই স্বার্থপর দৈত্যের মত, যারা চলার পথে আবর্জনা দূর করে, প্রাণময় সত্তাকে র(ার চেষ্টা করে না, প্রতিটা প্রাণের বেঁচে থাকার মূল্যের আলাদা আলাদা স্বীকৃতি দিতেও চায় না। কাকা বলাইয়ের সামনেই উচ্চারণ করে, 'মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।'

একথা শুনে চমকে ওঠে বলাই, তাই বলে, 'না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।'

বলাই এরপর দরবার করে তার কাকির কাছে। কেননা এই কাকিই বলাইকে মাতৃহীন অবস্থায় মানুষ করেছিলেন। কাকি নিঃসন্তান। তার কাছে বলাই আশ্রয়ের মতো, আবার বলাইয়ের কাছে অসহায় ভাবে বেড়ে ওঠা, আপাতভাবে অপ্রয়োজনের শিমূল গাছটিও সন্তানের মতই। কোলে বসে কাকির গলা জড়িয়ে অসহায় শিশু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।'

কাকি এই সময় বলাইয়ের প(নিয়ে, তার যন্ত্রণা বুঝতে পেরে বলেছিল, 'ওগো শুনছ। আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।'

বলাইয়ের গাছটি থেকে গেল। এবং এই গাছটি বেড়েও উঠল নির্লজ্জের মত। কাকার চোখে প্রতিদিন গাছটা বেড়ে উঠতে লাগল। 'গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নির্বোধের মত। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠেছে। যে দেখে, সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরও দু-চারবার এর মৃত্যুদন্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।'

কিন্তু বলাইকে রাজি করানো যায় না। এ লোভও দেখানো হয়, তাকে শিমূল গাছ এনে দেওয়া হবে। এবং ওর কাকিও বলে, 'আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।' বারবার কাকির প্রতিবাদে পু(ষরূপী নিষ্ঠুরতা দিয়ে ধ্বংস করা হয় না গাছকে।

ইতিমধ্যে বলাইকে একদিন তার বাবা নিয়ে গেল, বলাইয়ের কাকি চোখের জল ফেলেন এবং বলাইয়ের একপাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়াচাড়া করেন।

'শেষ চিঠি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--

'অমলির ঘরে ঢুকতে পারিনি বহুদিন
মোচড় যেন দিত বুকে।
ভাড়াটে আসবে, ঘর দিতেই হবে সাফ করে--
তাই খুললেন ঘরের তালা।
একজোড়া আগ্রার জুতো,
চুল বাঁধবার চি(ণি, তেল, এসেন্সের শিশি
শেলফে তারপড়ার বই,
ছোটো হারমোনিয়াম।'

/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, (শেষ চিঠি) বি(ভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনমুর্দ্রণ ১৪০২, কলকাতা, ৬৭৬ পাতা/।

অন্যদিকে শিমূল গাছটির বাড়বাড়ন্ত দেখে একদিন গাছটিকে কেটে ফেলা হল। কাকির কাছে সংবাদ থাকল গোপন। বাল্যদোসর শিমূল গাছের ছবি চেয়ে পাঠাল বলাই। কাকি কাকাকে অনুরোধ করল। কাকা জানাল গাছটা কাটা হয়ে গেছে।

স্বভাবতই দা(ণভাবে মর্মাহত হল বলাইয়ের কাকি। বলাই ছিল তার নিঃসন্তান জীবনে একমাত্র আশ্রয়স্থল। বলাই চলে গেছে। কিন্তু ছিল তার আদরের গাছটা। যা ছিল কাকিরও পরম অবলম্বন। অথচ তার কাকা সমস্ত জেনেও গাছটা কেটে ফেলেছে। নিষ্ঠুরতার কোন সীমা নেই তার। তাছাড়া কাকির কাছে গাছটা কেবল গাছ নয়, আর কাকার কাছে নেহাতই ফালতু একটা আবেগ, কিংবা সচেতনভাবেই বলাইয়ের অস্তিত্বকে তিনি উপে(া করতে চান--তিনি মুছে ফেলবেন সমস্ত স্মৃতি, থাকবে কেবল বাস্তবটুকুই--এই মুহূর্তে চলার পথে যতটুকু দরকার বা প্রয়োজন। বলাইয়ের কাকি প্রতিবাদ করে--'বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেকদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কননি।' দুই পু(ষের নিষ্ঠুরতা গ্রহণ করে তিনি প্রতিবাদ করলেন, 'বলাইয়ের বাবা ওকে কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছিঁড়ে(আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে (ত করে দিলে।'

লেখক জানিয়েছেন, 'ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।'

কাকি গাছটা বাঁচাতে পারে না ঠিকই কিন্তু ঐ গাছ র(ার জন্যে তার আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু গাছ কেটে দিলে তিনি খেতে পারেন না। গাছকে প্রাণ হিসাবে মেনে নিয়ে, তার (য়ে তিনিও কষ্ট পান।

মুক্তি(র ভুল দিক

নারী প্রগতি একক ও অতিস্বাধীনতা

নারীবাদ আজ সমাজের সর্বস্তরে আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এর ভ্রান্ত দুটি দিক আছে--১. নারীবাদ, ২. পু(ষকে বাদ বাদ দিয়ে ভাবা এবং নারী স্বাধীনতার নাম করে স্বেচ্ছাচার করা। বলাবাহুল্য এই দুই দলই সমাজভাবনার মূল সুরটিকে ধরতে পারে না। কারণ আর কিছুই নয়, সমাজ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নের অভাব। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই এই সুরটিকে ধরতে পেরেছিলেন আর লিখেছেন এরকম দুই নারীর কথা যারা ভ্রান্ত ভাবনায় চালিত হয় অবশেষে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এরকম দুটি গল্পঃ প্রগতিসংহার এবং ল্যাবরেটরি।

'প্রগতিসংহারে'র সুরীতি পু(ষকে বাদ দিয়ে নারী স্বাধীনতা চায় আর 'ল্যাবরেটরি'র নীলা স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার করে।

প্রগতিসংহার (১৩)

'প্রগতিসংহার' গল্পের শু(তেই পাই ছেলেমেয়েদের মেলামেশার কথা--'এরা প্রায় প্রত্যেকেই ধনী ঘরের--এরা পয়সার ফেলাছড়া করতে ভালোবাসে।' পু(ষরা মেয়েদের মনে ঢেউ তুলত। মেয়েরা বলত, 'আমাদেরই কলেজের ছেলে এরা।' 'এই তাদের মাঝখানে একটা সংঘ তেড়ে ফুঁড়ে উঠে মেলামেশা ছারখার করে দেবার জো করলে। সংঘের হাল ধরল সুরীতি--নাম দিল 'নারী প্রগতিসংঘ।' এই সংঘে 'পু(ষের ঢোকবার দরজা ছিল বন্ধ। সুরীতির মনের জোরের ধাক্কায় একসময়ে যেন পু(ষ বিদ্রোহের একটা হাওয়া উঠল। পু(ষরা যেন বেজাত, তাদের সঙ্গে জলচল বন্ধ। কদর্য তাদের ব্যাভার।'

কালান্তরে 'নারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--'নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তার তাঁদের র(ণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তি(র সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত(করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধ র(ণশীলতা--সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নতুন সৃষ্টির যুগ।' /*রবীন্দ্ররচনাবলী,* দ্বাদশ খণ্ড, (কালান্তর--নারী) বি(ভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপল(২য় সং ১৪০২, কলকাতা, ৬২৫ পাতা/।

পু(ষ প্রবেশের এই নিষেধাজ্ঞা ও আসলে অন্ধ সংস্কারই। সুরীতি জানিয়ে দেয়, সরস্বতী পুজোয় হৈ-চৈ করা চলবে না। 'সুরীতির স্বভাব খুব কড়া, মেয়েরা তাকে ভয় করে। তাছাড়া নারী প্রগতিসংঘে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে যে কোনো পালাপার্বনে তারা কিছুমাত্র বাজে খরচ করতে পারবে না। তার বদলে যার পয়সা আছে পূজা-আর্চায় তারা যেন দেয় গরিব ছাত্রীদের বেতনসাহায্য বাবদ কিছু কিঞ্চিৎ।'

ছেলেরা মহাখাপ্পা হয়ে উঠল। বললে, 'তোমাদের বিয়ের সময় আমরা গাধার পিঠে বরকে চড়িয়ে যদি না নিয়ে আসি, তবে আমাদের নাম নেই।'

মেয়েরাও বলল, 'এরকম জুড়ি গাধা একটার পিঠে আর একটা, আমাদের সংসারে কোনো কাজে লাগবে না। সে দুটি আমরা তোমাদের দরবারে গলায় মালা দিয়ে আর রক্ত(চন্দন কপালে পরিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

এভাবে ছেলে-মেয়েতে ভাগ হয়ে যাওয়ায় খুব মুশকিল হল। ছেলেরা কেউ কাছে, এসে কথা বলতে গেলেই মেয়েরা নাকি তুলে বলতে আরম্ভ করলে 'এ বড্ড গায়ে পড়া।' ছেলেদের কেউ কেউ মেয়েদের পাশে বসে সিগারেট খেত--এখন সেটা তাদের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। ছেলেদের উপর রূঢ় ব্যবহার করা ছিল যেমন মেয়েদের আত্মগরিমা। কোনো ছেলে বা মেয়েদের জন্য জায়গা করে দিতে এগিয়ে এলে বিদ্রোহিনী বলে উঠত--'এইটুকু অনুগ্রহ করবার কী দরকার ছিল! ভিড়ের মধ্যে আমরা কারও চেয়ে স্বতন্ত্র অধিকারের সুযোগ চাইনে।'

তারা মনে করত পু(ষের বুদ্ধি মেয়েদের তুলনায় কম। কেউ যদি পরী(য় ভাল করত, মনে করা হত তার প্রতি প(পাতিত্ব করা হয়েছে।

এভাবে নারীবাদের প্রবর্তিকা সুরীতি ছেলে ও মেয়েতে বিভাজন ঘটিয়ে দিল।

'কালান্তরে'র 'নারী' প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--'যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত(মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে

তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে--এমন কি, না আসতেও পারে--কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্বাগ্রে।' [*রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, (কালান্তর-নারী) বি(েভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপল(ে ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ৬২৫ পাতা]।

কেবল তাই নয় মেয়েরা সাজতও না--কারণ তারা মনে করত--'পু(ষের মন ভোলাবার জন্যে মেয়েরা সাজবে, গয়না পরবে, এ অপমান মেয়েরা অনেকদিন ইচ্ছে করে মেনে নিয়েছে, কিন্তু আর চলবে না।' অর্থাৎ নারীকে এগোতে হলে পু(ষকে বাদ দিয়েই এগোতে হবে। আর তাই চলে, নানা আয়োজন। তাদের যোগ্যতা লাভের পথ ছিল কেবল তাদের একার।

সুরীতি তার গয়নাগুলো দিদিমাকে দিয়ে বললে--'এগুলো তোমার দান খয়রাতে লাগিয়ে দিয়ো, আমার দরকার নেই, তোমার পুণ্যি হবে।' সুরীতি তার ইমোশনের জোয়ারে ভেসে গেল। সুরীতি এবং তার পরিচালিত দলের কাছে(জোয়ারে ভেসে থাকাটাই একমাত্র সত্য।

মেয়েরা তাকে বলত, 'দেখ সুরীতি, 'অত বাড়াবাড়ি করিস নে।' রবি ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' পড়েছিল পড়েছিস তো? চিত্রাঙ্গদা লড়াই করতে জানত, কিন্তু পু(ষের মন ভোলাবার বিদ্যে তার জানা ছিল না, সেখানেই তার হার হল।' 'চিত্রাঙ্গদা' বলেছিল--'পূজা করি মোরে রাখিবে উর্দ্ধে/ সে নহি নহি,/ হেলা করে মোরে রাখিবে পিছে/ সে নহি নহি,/যদি পার্শ্বে রাখ মোরে/সংকটে সম্পদে/সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে/সহায় হতে,/পাবে তার তুমি চিনিতে মোরে।' [*রবীন্দ্ররচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, (চিত্রাঙ্গদা) বি(েভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপল(ে ২য় সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, ১৬৪ পাতা]।

কেউ কেউ ছাড়তে শু(করেছিল সুরীতির দল, এদের মধ্যে সলিলাও ছিল। কেউ কেউ ভালবাসত ছেলেদের শি্যভলরি।

লেখিকা সফিয়া খাতুন লিখেছেন--'বলছিলাম আমাদের প্রকৃত শি(ার কথা। প্রকৃত শি(া অর্থাৎ ভোগ বিলাসিতা শূন্য যে শি(া, সে শি(া আমাদের মেয়েদের দিতে পারলে, আমাদের সব দিক দিয়েই উন্নতি দেখা যেত।' [সফিয়া খাতুন, *নারীর অধিকার ও অন্যান্য*, (আমাদের কথা), সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৩০৬, ঢাকা, ১৬০ পাতা]।

সুরীতির এই বিদ্যার জন্যে অনেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল নীহার। নীহারকে (মা চাইতে বললে সে রাজি না হাওয়ায় তাকে ছাড়তে হল কলেজ। সলিলার কাছে সে মাসোহারা নিত--তাতে তার কুণ্ঠা বা সংকোচ ছিল না। তাছাড়া মেয়েরা মনে করত নীহার কিছু একটা হবে, সমস্ত বি(ের কাছে তার প্রতিভার একটা অকুণ্ঠিত দাবি আছে।

নীহার ফিরে এল পাহাড় থেকে, কিন্তু একবারও বলল না, সুশীলার মৃত্যুর কথা। তার দখল ছিল ফরাসী ভাষায়, তাই সরবর্ণ ইউনিভার্সিটির প্রত্নতত্ত্ববিদ এলে নীহার চমকে দিল ফরাসী ভাষার বক্তৃ(তা দিয়ে। সুরীতি তার নারী প্রগতি সংঘ ভেঙে ফেলল--তার একমাত্র সাধনা হল নীহারকে পাওয়া। সে জানত নীহারে মন নেই, তাই যাতে সে সন্তুষ্ট তাই দিয়ে চলল তার পুজো নিবেদন। নীহারের জন্য সে নিজেকে অবগুণ্ঠিত করে রাখল। কারণ নীহার বক্তৃ(তায় বলেছিল--'সব সুন্দর জিনিসের একটা অবগুণ্ঠন আছে, তার উপরে পু(ষদৃষ্টির হাওয়া লাগলে তার সৌকুমার নষ্ট হয়ে যায় আমাদের দেশের মেয়েরা যে পারতপ(পু(ষদের কাছে দেখা দিত না, তার প্রধান কারণ এই যে, দেখা দেওয়ার দ্বারা মেয়েদের মূল্য কমে যায়। তাদের কমনীয়তার উপর দাগ দেওয়ার দ্বারা মেয়েদের মূল্য কমে যায়। তাদের কমনীয়তার উপর দাগ পড়তে থাকে।'

যশোধরা বাগচী লিখেছেন, 'যে নারীবাদ মেয়েদের বিশুদ্ধ ভাবমূর্তি তৈরি করার কাজে লিপ্ত সে নারীবাদ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।' [যশোধরা বাগচী, *নারী ও নারী সমস্যা*, (নারীবাদ কি প্রগতিবাদের পরিপন্থী) , অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ ১৪০৯, কলকাতা, ৬৫ পাতা]।

সুরীতি আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করল। পু(ষ ও অভিভাবকের সঙ্গেই সিনেমা দেখতে বের হয়। এমনকি নীহারের মন পাবার জন্যে সামাজিক নিমন্ত্রণও এড়াতে লাগল।

সুরীতি একসময় নারীপ্রগতিতে বি(াস করত আর পু(ষের সঙ্গে থেকে সে হয়ে পড়ল অবগুণ্ঠনবতী। এমনকি চাকরি পেলে নীহার বাদ সাধলে। নীহারের বুদ্ধিতে সুরীতি ডুবে যেতে থাকল। সেখানে ছেলেরা পড়ে তাই নীহারের আপত্তি। অর্ধেক বেতন নিয়ে সে বললে বাকি টাকায় ছেলেদের আলাদা পড়াবার ব্যবস্থা হোক। ভুল আদর্শবাদের চূড়ায় গিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করতে লাগল

সুরীতি।

প্রায়ই সে শুনতে পেত--'নীহারের অবস্থা ভালো নয়, পড়বার বই তাকে ধার করে পড়তে হয়। তখন সুরীতি নিজের জলপানি থেকে ওকে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগল।' সুরীতি বুঝতেও পারত না, 'যার বিদ্যার অভিমান আছে অর্থের বিষয়ে সে কি করে সাহায্য নেয়?' কারণ সুরীতির অনুরোধে বাংলা অধ্যাপকের খালি পদে নীহারকে নেওয়ার কথা হওয়াতেও নীহার রাজি হয় না।

এই জেদে সুরীতি হার মানে এবং শরীর ত্র(মশই খারাপ হয়ে যায়। বাড়ির লোকে গিয়ে বলে--'হয় তুমি একে বিবাহ করো, না হয় এর সঙ্গ ত্যাগ করো।' নীহার জানায়--'বিবাহ করা তো চলবেই না--আর ত্যাগের কথা আমাকে বলছেন কেন, সঙ্গ ইচ্ছে করলেই তো তিনি ত্যাগ করতে পাবেন, আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।'

সুরীতি জানত নীহারের কাছে তার সুবিধা ছাড়া আর কোন কিছুর মূল্য নেই, তবু সেই মূল্য মেটাবার চেষ্টা করত। মফস্বলে বেশি মাইনের প্রিন্সিপালের পদ পেয়েছিল, কিন্তু তার মনের ভেতর বাজত 'আমি তো খুব আরামে আছি, তিনি তো ওখানে গরীবের মতো পড়ে থাকেন--এ আমি সহ্য করব কী করে?' অবশেষে নীহারের সঙ্গে সমান হবার জন্যে, অল্প বেতনের শি(য়িত্রীর পদ নিল। পু(ষের মন ভোলানোর বিদ্যা তার জানা ছিল না বলেই ত্যাগে সে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কলকাতায় সে বাসা ভাড়া করল, স্যাঁতস্যাঁতে ঘর--নিজেই রান্নাবান্না শু(করে অপথ্য খেতে লাগল। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল তার। মাঝে মাঝে স্কুল কামাই হতে লাগল। ধরা পড়ল তার (য়রোগ হয়েছে। সে হাসপাতালে ভর্তি হল, কিন্তু গচ্ছিত টাকা সে নীহারকে দিতে লাগল। নীহার তাকে কোনদিন দেখতেও এল না, ত্যাগের অনিবার্য ফলশ্রুতি এই পরিণামে গিয়ে দাঁড়াল।

সুরীতি একদিন নারী প্রগতি করেছিল সেটিও যেমন ভুল, নীহারকে প্রশ্রয় দেওয়াও ভুল। সুরীতি অপাত্রে তার ভালোবাসা দান করেছিল।

অন্যদিকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন ঃ 'এক শ্রেণীর শি(ত নারীই সহযোগিতা করে চলেছে পু(ষাধিপত্য ও নারী-অধীনতা র(ায়(ওই নারীরা পরগাছা, তারা আজও সুখ পায় সুখকর ত্রীতদাসীত্বে। (নারীরা) নিজেদের স্বার্থে সেবা করে চলে পু(ষতন্ত্রের(তারা সুবিধার বিনিময়ে বাতিল ক'রে দেয় নিজেদের সত্তা ও স্বাধীনতা। শুধু নিজেদের নয়, তারা শত্রুতা করে চলে স্বাধীন নারীর সাথে। নিজের স্বাধীনতা হারানোর পর অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট করা হয় তাদের কাজ। শি(ত ধনী গৃহিণীর যে স্বচ্ছলতার মধ্যে থাকে, শি(ত কর্মজীবী নারীরা সাধারণত ততটা স্বচ্ছলতায় থাকে না(তারা বিচিত্র বিলাসের মধ্যে থেকে থেকে উপহাস ক'রে চলে কর্মজীবী শি(ত নারীদের।' /হুমায়ুন আজাদ, *নারী* (নারীর ভবিষ্যৎ) আগামী প্রকাশনী, ৩য় সং ২য় মুদ্রণ ১৪০৭, ঢাকা, ৩৬২-৬৩ পাতা/।।

অন্যদিকে এক সা(াৎকারে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন ঃ 'মহিলাদের সর্বপ্রথম পরিচয় এটাই যে তারাও মানুষ, সেই জায়গা থেকে স্বভাবতই আমাদের মুক্তি(র স্বাদ পেতে ইচ্ছে করে। সুতরাং আমি চাই মহিলাদের প্রথমে একজন 'ব্যক্তি(' হিসাবে গণ্য করা হোক। সমাজ সংসারকে সুন্দর করতে নারী ও পু(ষ উভয়েরই প্রয়োজন আছে। সুতরাং এই কারণে সমাজের নিয়মগুলি যুক্তি(দিয়ে বুঝতে হবে, এর মধ্যে ভাগাভাগির কোন জায়গা নেই। আমার মনে হয় পারিবারিক সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য নারী ও পু(ষ উভয়েরই একে অপরের মতামতকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। নারী ও পু(ষ উভয়েরই এই সম্মান অর্জনের যোগ্যতা থাকা দরকার। সমাজে যোগ্য মর্যাদা ও সম্মান পাবার জন্য নারীরা নিজেদের উপযুক্ত(করে গড়ে তুলবে, তবে সেই মুক্তি(র স্বাদ পাবে।' /*চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন*, (১৯৯৫, বেজিং ফিরে দেখা, গণ উন্নয়ন পর্ষদ), প্রথম প্রকাশ ১৪০৫, কলকাতা, ৪৪ পাতা/।

সুরীতি ভাবেনি--পরাধীন দেশের সুরীতিরা এভাবে ভাবতেও শেখেনি। শিখলে সমাজের উন্নতি হোত। তবে এ প্রক্রি(য়া আজও চলছে। তাই স্বাধীনতা পেয়ে অনেকেই নেমেছেন স্বেচ্ছারিতার পথে। ল্যাবরেটরির নীলা এরকমই এক দৃষ্টান্ত। পরবর্তী আলোচনা নীলাকে নিয়েই।

ল্যাবরেটরি (১৩৪৮)

'ল্যাবরেটরি' গল্পটিও পূর্বে আলোচিত। কিন্তু আলোচনা হয়েছে মূলত সোহিনী চরিত্রটি--এই পর্বের নীলা চরিত্রটি আলোচিত হবে। আলোকপ্রাপ্তা নতুন বাঙালি নারীর রূপচ্ছবি দেখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বেনোজলে ভেসে আশা যে কোন আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত(নএ(র্থক অংশের ছবিকেও অস্বীকার করেননি। নীলা সেই নএ(র্থক অংশের প্রতীক। সোহিনীর মধ্যে যদি ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যবাদ সদর্থকবাদ ফুটে ওঠে থাকে, তবে নীলার মধ্যে ফুটেছে ব্যক্তি(স্বার্থ। স্বজনের সঙ্গে মামলা করে সোহিনী ছলাকলার পেখম তুলেও শেষপর্যন্ত স্বামীর সম্পত্তির লভ্যাংশ নন্দকিশোরকেই ল্যাবরেটরি গড়ার কাজে উৎসর্গ করেছে। আর নীলা সেই টাকা হাতিয়ে মদমত্ত হস্তিনীর মত যথেচ্ছাচার করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে' আরো বলেন, 'মা আর মেয়ের কত তফাত সেইটেই তো বেশি করে দেখিয়েছি। /রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ*, ৪র্থ খণ্ড, বি(্বভারতী, গ্রন্থপরিচয়, শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ,। কবি কথা, বি(্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ কার্তিক-পৌষ, কলকাতা, ১০২৩ পাতা/।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার মনে হয় পৃথিবীতে নতুন যুগ এসেছে। অতিদীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পু(ষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র, অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র--গড়েছিল পু(ষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়েছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে, সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আট্‌কা পড়েছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে। /*রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, (কালান্তর--'নারী' প্রবন্ধ) বি(্বভারতী, ১২৩তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপল(ে ২য় সং ১৪০২, কলকাতা, ৬২৪ পাতা/।

নীলা'রা বেড়োতে চায়। বেরিয়েছে সোহিনীরা। বলা যায় সোহিনীর পরের ধাপ নীলা। যে ধাপ ভুল। তাই সোহিনীর নীলা সম্পর্কে রয়েছে ভয়, আশঙ্কা, অবজ্ঞা, উদাসীনতা। সোহিনী'র প্রাণ যেমন ল্যাবরেটরি, নীলার প্রাণ আমোদ-আ(াদ, উচ্ছ্বাস-অর্থ ও যৌবনের লাস্যময় বিলাস। সোহিনী তাই বলেছিল--'আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে।' সোহিনী ত্যাজ্য হল নীলা, কারণ নীলার স্বেচ্ছাচারিতা, আদর্শহীনতা নতুন যুগভাবনার পরিপন্থী।

সোহিনী তার কন্যা সম্পর্কে বলেছে, 'পোড়াকপালী সুন্দরীও বটে' নীলা'র পূর্বে বিয়ে হয়েছিল। নীলা বিধবা—তার আসল নাম নীলিমা। 'কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরও দু-চার সম্প্রদায়ের যুবক এখানটায় অকারণ পদচারণায় চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ ছেলেটিই চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তারপরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফায়েড, তারপরে মুক্তি(।' সোহিনী ল(্য করে, 'মেয়ের ছটফটানি।' মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল, এদিকে, ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। সোহিনী কাউকে ছাড়পত্র দেয় না। সোহিনীর স্বামী যাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন, সেই ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করছে। রেবতীকে ল্যাবরেটরিতে আনার জন্যে--অন্যদিকে নীলাকে প্রদর্শন করা হল। নীলা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করে। সে জানায়--হাইয়র স্টাডি মুভ্‌মেন্টে সে যুক্ত(হতে চায়। রেবতী 'ল্যাবরেটরি'তে প্রবেশ করলে, নীলাকে দূরে সরিয়ে রাখে সোহিনী। নীলা জানায়--'মা, তুমি আমাকে কী মনে কর ভেবে পাই নে। কাছে ঘেঁষতে যাব তোমার ঐ খুদে সার আইজাক নিউটনের এমন (চি আমার? মরে গেলেও না।' রেবতীকে সে নকল করে। বলে, 'ঐ স্টাইলের পু(ষকে নিয়ে আমার চলবে না। যে-সব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।'

নীলার কাছে পু(ষ হল শিকার। নীলা'র মা শঙ্কিত হলে নীলা জানায়--'কখন তোমার কী মর্জি কিছুতেই বুঝতে পারি নে মা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, সে কি আমি বুঝতে পারি নি?'

নীলাকে কোন সাধকের কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না সোহিনী। তাই বলে 'তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। নীলা স্বচ্ছন্দ গতিতে প্র(্ন করে,--'তাহলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি।'

নীলা তার বিয়ের ব্যাপারে এবং তা প্রকাশ করবার বিষয়ে স্বাধীনচেতা। বরং বলা যায় প্রগ্‌লভ। তার কাছে বিয়ে করাটা যে কাউকে চলতে পারে, কারণ ভাঙাও সহজ। মোতিগড়ের রাজকুমার তার পছন্দের পাত্র কারণ 'তার তিনটে বিয়ে, মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে বলে। ভালোবাসা নয় নীলা বিয়ে করবে খানিকটা ছুটি পাবে বলে! নীলা বিয়ে করবে যেন বিয়ে করতে হয় বলে, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলেই সে খুশি। অতি স্বাতন্ত্র্য নীলার আছে--আর তা থেকেই আসে পারভারশন বা বিকৃতি। নীলা এও জানিয়ে দেয়--

উনি যদি হ্যাংলাপনা করেন।' নীলার সবটাই উপর উপর কথা, তার মধ্যে গভীরতার খোঁজ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তরে'র 'নারী' প্রবন্ধে লিখেছিলেন,

'আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা।' [*রবীন্দ্ররচনাবলী,* দ্বাদশ খণ্ড, (কালান্তর--নারী) বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২য় সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, ৬২৪ পাতা]।

নীলা বের হয়। কিন্তু তার রূপ ভিন্ন। নীলাকে আটকানো যায় না। সোহিনী আইমাকে দেখতে দেশে গেলে নীলা দখল করে আইজ্যাক নিউটনকে। নীলাকে নিয়ে যেতে চায় সোহিনী। কিন্তু জানায় নীলা--'ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।' নীলা জানায়, ওরা চাঁদা নিতেও আসবে। সোহিনী জানায় 'আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই।' সোহিনী জানিয়ে দেয়--'নিঃস্বার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার স্বামীর দত্ত অংশে তোমার যে টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পার?' নীলার সলিসিটার বঙ্কুবাবু, সোহিনী জেনে ফেলে বঙ্কুবাবু তাকে আরো কিছু পরামর্শ দিচ্ছে। নীলা চুপ করে থাকে মা'র এই জেনে যাওয়া দেখে।

এরই প্রতিশোধ নেয় নীলা। রেবতীকে মুগ্ধ করার জন্যে পড়ে নেয় রাতকাপড়। 'রেবতীর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে।' গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।' পাঞ্জাবী প্রহরী এসে বলল, 'মায়িজি, বহুত শরমকি বাৎ হ্যায়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।' জোর করে রেবতী ঠেলে দিল নীলাকে। নীলা যাবার সময় চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল--বাষ্পার্দ্র কণ্ঠ ভেসে এল রেবতীর কাছ থেকে। কারণ রেবতীর মনে হতে লাগল রাতকাপড়ের মধ্যে থেকে নীলার নিঁখুত দেহ। আসলে নীলার এটাই ছিল উদ্দেশ্য--শরীরী প্রলোভনে রেবতীকে বশ করা। কারণ তার সূক্ষ্ম ঈর্ষার জগতে আছে মা, যে রেবতীকে যতখানি দেয়, নীলাকে তাও দেয় না। নীলা আবার ঘরের মধ্যে আসে--রেবতী জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, করতে চায় এই অছিলায়। নীলা জানার 'ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পেট্রন।' যন্ত্রের মত সই করে দেয় রেবতী। নীলা চায়ের আসরে যাবে না ভেবেও রেবতী গেল। সেখানে নীলা এসে তাকে মালা পরাল সাহিত্যিক হরিদাসবাবু রেবতীর গুণপণার ব্যাখ্যা করল, রিপোর্টাররা এল, ওর মন থেকে সংকোচের খোলস খুলে গেল, তার নিজের দায়িত্ব কত মহৎ, তা সে অনুভব করল।

নীলা রেবতীকে জ্বালাময় মদ ঢেলে দিল। রেবতীর থেকে ঘোষণা আদায় করে নিল বিয়ের।

নীলা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।'

রেবতী স্বর্ধাভরে বললে, 'ভয় করি? কখনও না।'

'আমার মাকে আপনি ভয় করেন না?

'ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি।'

'আমাকে?'

'নিশ্চয় ভয় করি।'

'সেটা ভালো খবর। মা বলেছেন, কিছুতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।

'কোনো বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।'

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, 'তুমি হয়তো জান তোমাকে কতখানি চাই।'নীলার মাথাটা আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে রেবতী বলল, 'তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।'

'জাত?'

'ভাসিয়ে দেব জাত।'

'তাহলে রেজিস্ট্রারের কাছেই নোটিস দিতে হবে।'

‘কালই দেব, নিশ্চয় দেব।’

নীলা’র ল(্য হয় রেবতী, কারণ রেবতীকে নীলা ভেবেছিল সম্পদের অধিকারী এবং জ্ঞানের সম্রাট--তার সঙ্গে তার স্বভাবে ছিল বোকামি। এ সবগুলিকেই সে হাতিয়ার মনে করেছিল।

পান্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌ(ষ ফিকে হয়ে আসছে, তাকে নীলার পছন্দ না হলেও বিয়ে করা চলে। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়, ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ানো আছে তার পরিমাণ প্রভূত!

অন্যদিকে রেবতীর কাজ পন্ড হয়ে যাবার জোগার। তার মনে হয়, এই বুঝি নীলা আসবে--পেছন থেকে এসে ওর চোখ টিপে ধরবে। নীলার মনের কোণে কোন শঙ্কা নেই--ওর (তিতে যে পৃথিবীর (তি হচ্ছে সে ব্যাপারে। দিনের পর দিন রেবতীকে জালে জড়াচ্ছে সে। নীলা ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে চুরট ধরায়। নীলা বলে, ‘এই দেহটার পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের--আসল দামী জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারে!’ রেবতীও ভাবে, ‘ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশি, শাঁসটা পেলে না।’

নীলা হালদারের বাহু ধরে চলে যায় ডায়মন্ডহারবারে--

ম্যানেজার ব্রজেন্দ্র হালদার মচ্‌মচ শব্দে এল। বললে, ‘নাঃ, এ অসহ্য, যখনই আসি নীলাকে দখল করে বসে আছে। কাজ নেই, কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেখেছে আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।’

নীলা তাকে উস্‌কে দেয় ভট্‌চায গোঁয়ার বাঙাল বলে। তিনি বলেন, ‘তা হলে আমাদেরও পৌ(ষ চালাতে হবে। এখন থেকে জাগানী ক্লাব মেম্বাররা নারীহরণের চর্চা শু(করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।’

নীলা বললে, বেশ মজা লাগছে শুনতে। নারীহরণ, পাণিগ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পদ্ধতিটা কী রকম?’

হালদার বললে, ‘দেখিয়ে দিতে পারি।’

‘এখনই?’

হ্যাঁ এখনই?

বলেই সোফা থেকে নীলাকে আড়কোলা করে তুলে নিলে। নীলা চিৎকার করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে।

হালদার জানাল, ‘গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চললুম ডায়মন্ডহারবারে। আজ সন্ধের ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল, সেটা যাক গে চুলোর। একটা সৎকার্য করা হবে। ডাক্ত(ার ভট্‌চাজকে নির্জনে কাজ করবার সুবিধে করে দিচ্ছি। তোমার মতো অতবড়ো ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজন্য উনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।’

কিন্তু এরপরই এসে পড়ে সোহিনী। নীলা জ্বালা মেটায়। মায়ের বড় পেয়ারের ল্যাবরেটরি র(ার ভার রেবতীর উপর। নীলা জানিয়ে দেয়--পঁয়ষট্টি জন অতিথি’র কথা, সিনেমার গায়িকাকে চারশো দেবার কথা। সোহিনী রেবতীর উঠে যাবার কথা বললেও নীলা জানায়--রেবতী যেতে পারবে না, কারণ রেবতী জাগানী ক্লাবের মেম্বার। অতিথিরা না গেলে সে যাবে না।

অবশেষে মা ও মেয়ের ঝগড়ায় বিদায় নেয় অতিথিরা। নীলা জানতে পারে--সে নন্দকিশোরের সন্তান নয়। অভিমানে ঘা লাগে। এই প্রথম সোহিনীও তার মেয়েকে স্বীকৃতি দেয়--ল্যাবরেটরি বাঁচিয়েছে বলে। নীলা তাও বলে--‘কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজিস্ট্রি আপিসে নোটিস তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।’